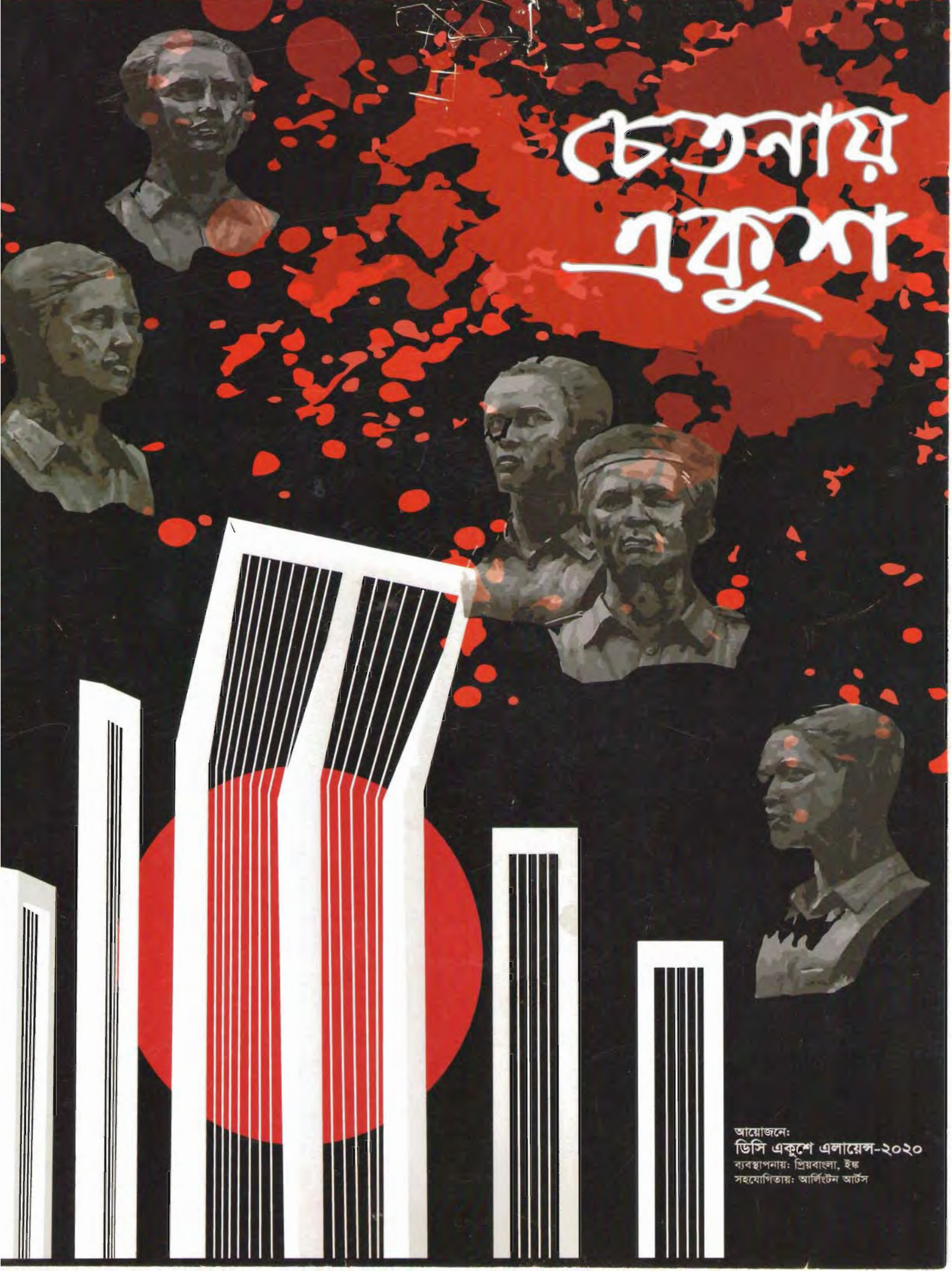
চেতনায় একুশ
আয়োজনে:
ডিসি একুশে এলায়েন্স-২০২০
ব্যবস্থাপনায়: প্রিয়বাংলা, ইঙ্ক
সহযোগিতায়: আর্লিংটন আর্টস

# আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

## এবং

## ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী!

## ডিসি একুশে এলায়েন্স ২০২০

প্রকাশকাল : ২২, ফেব্রুয়ারি ২০২০
প্রকাশক : ডিসি একুশে এলায়েন্স ২০২০
গ্রাফিক ডিজাইন : এস এম হযরত আলী
প্রচ্ছদ ডিজাইন : মারুফ রায়হান
প্রিন্টিং প্রেস : AlphaGraphics, USA

Greetings : DC Ekushey alliance 2020 (DCEA)
Editiorial Board

সম্পাদকীয় ৫

Message from Dignitaries
Ambassador Mohammad Ziauddin ৬
Donald S. Beyer Jr., Member of Congress ৭
Katie Cristol, Arlington County Board Member ৮
Marsha Semmel, Arlington Commission for the Arts ৯

সমন্বয়কদের পক্ষ থেকে দু'টি কথা : প্রিয়লাল কর্মকার এবং এ্যান্থনী পিউস গোমেজ ১০
ডিসি একুশে এলায়েন্স ২০২০ সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ১১
DC Ekushay Alliance 2020, Program Management Sub-committee ১৩
ডিসি একুশে এলায়েন্স ২০২০ : মহান একুশে উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা ১৭
DC Ekushay Alliance 2010-2020 : Compiled by Dr. Shoaib Chowdhury ১৮
একুশে ফেব্রুয়ারি, বাঙালির মুক্তি চেতনার ইতিহাস : সংকলনে এ্যান্থনী পিউস গোমেজ ২১

প্রবন্ধ
পরাধীন ব্রিটিশ ভারতে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রথম দাবী : ডঃ আবদুন্ নূর ২৪
বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সুদিন দুর্দিন : আনিস রহমান, পি.এইচ.ডি ২৬
প্রবাসে দ্বিতীয় প্রজন্মের একুশে ফেব্রুয়ারি : ডঃ আশরাফ আহমেদ ২৯
ছেলেবেলার একুশ : আনোয়ার ইকবাল ৩২
ভাষা এবং যাপিত জীবন : ওয়াহিদা নূর আফজা ৩৪
ডিসি মেট্রো এলাকার প্রথম রেপ্লিকা শহীদ মিনার ও তার ধারাবাহিকতা... : ডঃ আরিফুর রহমান ৩৫
বাংলাদেশ আমার দেশ : মযহারুল হক ৩৭

কবিতা
পরানজুড়ে : শুক্ল গাঙ্গুলী ৩৮
বর্ণ বৈষম্য : মোস্তফা তানিম ৩৮
পানসী তুমি কার : সামিনা আমিন ৩৮
একুশের চেতনায় বোবা বর্ণমালা : সুবীর কাস্মীর পেরেরা ৩৯
একুশ আমার শব্দ শব্দ খেলা : শাহানা শৈলী ৩৯
প্রভাতফেরী : মিজানুর খান ৩৯
দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা : মিজানুর ভূঁইয়া ৩৯

স্মৃতির পাতায় একুশে উদযাপন ২০১৯ ৪২
ডিসি একুশে এলায়েন্স ভাষা সৈনিকদের "অমর একুশে পদক-২০২০ প্রদান" ৫৩

# *DC Ekushey Alliance (DCEA)*

*An Alliance to Observer Bhasha Shahid Dibosh*

*&*

*International Mother Language Day*

*(Maryland, Virginia, and Washington DC)*

**Date and Time : February 22, 2020 at 5:00 PM**

**Venue :**

Thomas Jefferson Middle School Theater
125 S Old Glebe Rd; Arlington, VA 22204

আয়োজনে : DC Ekushey Alliance 2020 (DCEA)

ব্যবস্থাপনায় : প্রিয়বাংলা ইন্‌ক

PRIO BANGLA
www.priobangla.org
প্রিয়বাংলা

সহযোগীতায় : arlington arts

ARLINGTON
VIRGINIA

# Editor-In-Chief

Anis Ahmed

# Editorial Members :

Dr Aminur Rahman

Anthony P Gomes

Dr Shoaib Chowdhury

Pryalal Karmakar

Sharafat Hussain Babu

Shamsuddin Mahmud

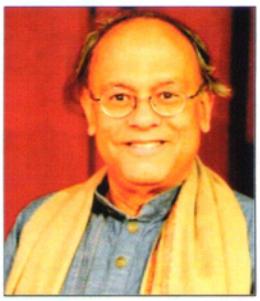

# সম্পাদকীয়

একুশ যখন একটি সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হয় সংখ্যাতীত এক বিস্ময়কর সত্যে, একুশ যখন হয়ে ওঠে স্বাজাত্যবোধক এক অনামিক অনুভূতি, একুশ যখন বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকের এই তৃতীয় দশকেও জাগ্রত থাকে আমাদের অনুভবের আঙিনাজুড়ে, তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে একুশ আমাদের সেই চেতনার অপর নাম– যা আমাদের নিয়ে গেছে জাতি থেকে জাতিরাষ্ট্রের সিংহদ্বারে।

১৯৪৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের সংসদের ভাষা উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও হওয়া উচিৎ– সাংসদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই ন্যায়সঙ্গত, বলিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক দাবি যখন পাকিস্তানের সংসদে প্রত্যাখ্যান করা হলো, তারপর এই ভাষার দাবি সংসদের দেয়াল ডিঙিয়ে রাষ্ট্রের বৃহত্তর অঙ্গনে চলে এলো। পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই জানা। বাঙালির জাতিসত্ত্বাকে প্রান্তিকীকরণের যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিলো, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত জাতিরাষ্ট্রে পরিণত হলো। একটা প্রশ্ন কিন্তু আমরা কেউই করি না যে, একাত্তরের পঁচিশ কিংবা ছাব্বিশে মার্চ কিংবা ষোলই ডিসেম্বরের যুগান্তকারী বিজয় কোনোটাই কেন একুশকে ম্লান করে দেয়নি? এখনো যখন দেশ স্বাধীন, ভাষার অধিকার বিতর্কাতীতভাবে স্বীকৃত, তখনো একুশ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? এ জিজ্ঞাসার সম্ভবত একটাই জবাব– একুশের তাৎক্ষণিক তাৎপর্য ভাষা হলেও এর বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা অবধি। একুশতো থমকে থাকেনি একুশেরই মধ্যে। সেজন্যই একুশের শহীদদের অভিবাদন জানাই সশ্রদ্ধচিত্তে। তাঁদের প্রতি বাঙালি জাতির কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। কেবল বাঙালির কথাই বা বলি কেন, একুশ এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বিশ্বে সকল জাতির নিজস্ব ভাষার অধিকার পাবার দিন। ক্ষুদ্র যে সব জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, সেই সব ভাষা পুনরুদ্ধারে একুশ অনুপ্রাণিত করবে সবাইকে।

একুশ উদযাপনের জন্য গঠিত এই জোট ডিসির একুশে অ্যালায়েন্স কয়েক বছর ধরে এখানকার প্রায় সকল সংগঠনকে একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে যে একুশ উদযাপন করছেন, সেটি একুশেরই অবিভাজিত শক্তির পরিচায়ক। এই সব সংগঠন এবং তাদের পরিচালকদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য যে সব শিল্পী ও কলা-কুশলী তাঁদের স্বেচ্ছাশ্রম ও মেধা দিয়েছেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সকল দাতা ব্যক্তি ও সংগঠন এবং বিজ্ঞাপন দাতাদেরও।

চেতনায় একুশ, এ বছরের এই একুশে স্মরণিকার লেখক লেখিকাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আন্তরিক ও সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ সম্পাদকীয় পরিষদে আমার সতীর্থ ও সহযোগী সকল সদস্যকে।

এই পত্রিকায় অনিচ্ছাকৃত ও অনবধানগত কোনোরকম ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে আমি মার্জনা চাইছি।

একুশের স্মৃতি অমর হোক!

আনিস আহমেদ
সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C. 20008
Phone: (202) 244-2745
Fax: (202) 244-2771
E-mail: mission.washington@mofa.gov.bd

Ambassador

# MESSAGE

I am very pleased that the DC Ekushey Alliance, a coalition of seven associations/groups of Bangladesh is hosting and celebrating the "Amor Ekushey" as well as International Mother Language Day this year on 23rd February at the Kenmore Middle School in Arlington, Virginia. On this auspicious occasion, I extend my warm congratulations and sincere felicitations to all members of the DC Ekushey Alliance, other community associations and organizations and of the Bangladesh community joining the celebrations and representing their respective language, culture and heritage.

Ekushey is a symbol of grief, strength and glory in the life of every Bangalee. I recall with deep reverence all the martyrs who laid down their lives for the cause of their mother tongue. I also recall with profound respect the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who led the language movement since 1948 and was arrested for his active role.

I am confident that the celebration of the International Mother Language Day will resonate the glory of 'Amar Ekushey' and promote Bangladesh's rich and vibrant culture, heritage and traditions. It would be a fabulous way of showcasing the pride of Bangladesh and its people among all people, living at home or abroad. The event would surely leave a lasting impression on all, particularly the American audience. It would also make a significant contribution towards building bridges among the Bangladeshi Americans and all other communities comprising the incredibly diverse and yet cohesive social fabric of this great country.

This is a great occasion for the Bangladeshi Americans who have stood united, along with almost all the socio-cultural organizations in the tristate area, under one umbrella to observe and celebrate this historic day.

I congratulate the organizers for this event and applaud the participants, and wish the Ekushey and International Mother Language Day celebrations, a resounding success.

Ambassador Mohammad Ziauddin

DONALD S. BEYER, JR.
8TH DISTRICT, VIRGINIA

COMMITTEE ON WAYS AND MEANS

COMMITTEE ON
SCIENCE, SPACE, AND TECHNOLOGY

# Congress of the United States
## House of Representatives
## Washington, DC 20515–4608

WASHINGTON OFFICE:
1119 LONGWORTH HOUSE OFFICE BUILDING
WASHINGTON, DC 20515
(202) 225–4376

DISTRICT OFFICE:
1901 N. MOORE STREET
SUITE 1108
ARLINGTON, VA 22209

January 27, 2020

DC Ekushey Alliance

Dear Friends:

I write to wish my sincere congratulations to you on this year's celebration of Mohan Ekushey February and International Mother Language Day.

Thanks to the sacrifices made by courageous Bengalis who fought to preserve their mother language in the face of government oppression, countries all around the world observe the occasion to celebrate international linguistic and cultural diversity. You have my sincere thanks for honoring this tradition and preserving Bengali cultural heritage in the Washington, D.C. area.

I hope that you enjoy what promises to be another wonderful celebration honoring the Bangla language and linguistic diversity all over the globe.

Sincerely,

Donald S. Beyer Jr.
Member of Congress

**Arlington County, Virginia**
**Office of the County Board**

2100 Clarendon Boulevard, Suite 300
Arlington, Virginia 22201

January 31, 2020

Dear DC Ekushey Alliance,

With respect and celebration, I offer my warmest wishes to the Bangladeshi-American community of the Washington metropolitan region on the occasion of International Mother Language Day, and a warm welcome to Thomas Jefferson Middle School and Arlington County.

As you commemorate this important day, and the memories of those who sacrificed for their language, culture, and self-determination, I am grateful for your contributions to our Northern Virginia and Arlington community.

In particular, the history of Bangladesh's fight for your human rights to communicate in your mother language is an inspirational story for diverse community that is strengthened by the presence of so many different languages. And the hospitality you show to others, and the pride you take in educating your neighbors about Bangladesh's rich heritage, greatly adds to the international tapestry that makes our region so special.

I hope that this International Mother Language Day is one of reflection and hope for all who attend Mohan Ekushey February. Best wishes.

Sincerely-

Katie Cristol

Katie Cristol
Arlington County Board Member

ARLINGTON COUNTY, VIRGINIA
COMMISSION FOR THE ARTS
1100 NORTH GLEBE ROAD, SUITE 1500
ARLINGTON, VIRGINIA 22201
(703) 228-0808 WWW.ARLINGTONVA.US

February 10, 2020

Dear DCEA Friends,

The Arlington Commission for the Arts is honored to support DC Ekushey Alliance's (DCEA) 2020 International Mother's Language Day (IMLD) celebration. Without language, there can be no art, and the diverse languages celebrated at this event contribute to a wide array of Arlington's cultural offerings. Each year, the entire Arlington community looks forward to the wonderful music, dance, dramatic performances and storytelling that celebrate IMLD.

Thank you for your many contributions to Arlington, and in particular, for enhancing the diversity of the local arts community.

Very truly yours,

Marsha Semmel

Marsha Semmel, Chair
Arlington Commission for the Arts

cc: Cynthia Richmond, Deputy Director, Arlington Economic Development
Michelle Isabelle-Stark, Director, Arlington Cultural Affairs

# মহান একুশে উদযাপন-২০২০

## সমন্বয়কদের পক্ষ থেকে দু'টি কথা

সুপ্রিয় সুধীমণ্ডলী

'ডিসি একুশে এলায়েন্স' (ডিসিইএ)-এর আয়োজনে, প্রিয়বাংলার ব্যবস্থাপনায় এবং আর্লিংটন আর্টস ও আর্লিংটন কাউন্টির সহযোগিতায় আজ উদযাপিত হতে যাচ্ছে "মহান ভাষা শহীদ দিবস" ও "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস"। প্রিয়বাংলার পক্ষ থেকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এই মহতী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে পেরে। সকল ভাষা শহীদ এবং ভাষা সৈনিকদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী! বাংলার যে সব বীর সন্তান মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দিয়ে সিক্ত করেছিল বাংলার মাটি, তাদের প্রতিটি রক্তকণার প্রতি বাংলার প্রতিটি মানুষ ঋণী। তাদের ঋণ কখনো শোধ হবার নয়, তাইতো আমরা প্রতি বছর ফিরে যাই তাদের স্মৃতির মিনারে ভালবাসা আর শ্রদ্ধাঞ্জলী নিয়ে। মাতৃভাষার প্রতি গভীরতম ভালোবাসার অনুভবে ভাস্বর মহান একুশের চেতনা। মহান একুশে আমাদের জাতীয় চেতনা, একুশ আমাদের অহংকার, একুশ আমাদের অন্তরের গভীরে অনুরণিত স্বদেশের প্রতি ভালবাসার প্রত্যয়, একুশ আমাদের জাতীয় স্বত্তার প্রেরণার উৎস শক্তি। আর সেই মহান একুশের ভাষা শহীদদের স্মরণে আজ ওয়াশিংটন প্রবাসী সমস্ত বাংলাদেশীদের সাথে নিয়ে এলাকার ২৩টি সংগঠন একত্রিত হয়েছে একুশে এলায়েন্স-এর ছায়াতলে এই মহান জাতীয় দিবসটি উদযাপন করার জন্য, এটা প্রবাসের মাটিতে আমাদের সবার জন্য এক পরম পাওয়ার অনুভূতি, এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ভাষা শহীদদের স্মরণে, আমাদের দেশ মাতৃকার চরণে মাথা নোয়াবার সুযোগ পেয়েছি, এতেই আমরা আপ্লুত!

'৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের শিখিয়েছে মায়ের ভাষা পৃথিবীর যে কোনো জনগোষ্ঠির প্রথম অধিকার, পৃথিবীর সমস্ত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা আমাদের সবার মানবিক কর্তব্য। ভাষা যে কোনো দেশের ভৌগলিক সীমানা, যে কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাস বা যে কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক মতবাদের উর্ধে। তাই ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন একটি স্বাভাবিক মানবিক আচরণ হওয়া উচিত বিশ্বজুড়ে। তাইতো মহান একুশের চেতনার তাৎপর্য উপলব্ধি করে ইউনেস্কোর উদ্যোগে একুশে আজ বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসার এবং এর মর্যাদা রক্ষার এক অনন্য প্রতীক হয়ে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। যে একুশ আমাদের দিয়েছে স্বাধিকার আদায়ের চেতনা, যে একুশ প্রশস্ত করে দিয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের পথ, যে একুশ বিশ্বব্যাপী দিয়েছে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার অনুপ্রেরণা... সে একুশ এখন বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের দিগন্তে চিরভাস্বর- এ যে আমাদের কত বড় পাওয়া, কত বড় অহংকার, তা ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি আমাদের নেই। এটা শুধু আমাদের অর্জন নয়, ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণের আনন্দ!

বিদেশের মাটিতে আমরা যারা আজ প্রবাসী জীবন যাপন করছি, আমাদের যে নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠছে মিশ্র সাংস্কৃতিক আবহে, আমরা যেন আমাদের গৌরবান্বিত '৫২-এর ইতিহাস, আমাদের অর্জিত স্বাধীনতার ইতিহাস তুলে দিতে পারি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে, যারা আগামীর বলয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের দেশের ইতিহাস, কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারা, এর মাঝে তারা যেন খুঁজে পায় তাদের পূর্বপুরুষের শেকড়, বৃহত্তর সামাজিক বলয়ের সীমানায় তারা যেন গর্বের সাথে উচ্চারণ করতে পারে... বাংলাদেশ আমার পূর্ব পুরুষের দেশ, আমার পূর্ব পুরুষের ঠিকানা... আমাদের পূর্ব পুরুষের ইতিহাসের বেলাভূমি!

ডিসি একুশে এলায়েন্সের সাথে সম্পৃক্ত সকল সংগঠন, সকল নেতৃবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবক, উপদেষ্টা এবং পৃষ্ঠপোষকদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এই আয়োজনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অসামান্য অবদানের জন্য। আমরা বিশেষভাবে ধন্যাবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সকল স্পন্সরকে তাদের আর্থিক সহযোগিতার জন্য, আমরা কৃতজ্ঞ ওয়াশিংটন প্রবাসী সকল বাংলাদেশীদের কাছে তাদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের জন্য। আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা আর্লিংটন আর্টস এবং আর্লিংটন কাউন্টির প্রতি তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের জন্য। আপনাদের সবাইকে সাথে নিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের মহতী সুযোগ পেয়েছি আমরা, সবার প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ভাষা শহীদের স্মৃতির প্রতি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী!!!

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ,

প্রিয়লাল কর্মকার এবং এ্যান্থনী পিউস গোমেজ
সমন্বয়ক,
ডিসি একুশে এলায়েন্স অমর একুশে উদযাপন-২০২০

# চেতনায় একুশ

## ডিসি একুশে এলায়েন্স ২০২০ সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

আমরা বাঙ্গালি ফাউন্ডেশন

আমেরিকান এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার এন্ড আর্কিটেক্টস

আমেরিকান বাংলাদেশী ফেন্ডশীপ সোসাইটি

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা,ইনক্

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল অরগানাইজেশন অফ ডি.সি.

বাংলাদেশী আমেরিকান ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রফেশনালস অরগানাইজেশন, ইনক্

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ গ্রেটার ওয়াশিংটন ডি.সি.

বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট,ইনক্

বাংলাদেশী এন্টারপ্রেনর্স সোসাইটি অফ টেলেন্টস্

বর্ণমালা শিক্ষাঙ্গন, ইনক্

বুয়েটিয়ান ইউ.এস.এ. ক্যাপিটাল রিজয়ন

চিটাগং ইউনিভার্সিটি এলামনাই ফোরাম, ইনক্

ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই ফোরাম, ইনক্

ধ্রুপদ, ইনক্

একাত্তর ফাউন্ডেশন,ইনক্

ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি . ডি এম. ভি.

ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি, ইনক্

ইছামতি - এ ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি ইউনিয়ন, ইনক্

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশন ইন ডি,সি.

নিউজ বাংলা, ইনক্

পিপল এন টেক ফাউন্ডেশন

প্রিয় বাংলা, ইনক্

স্বদেশ বাংলাদেশ, ইনক্

চেতনায় একুশ

International MotherLanguage Day
Celebration 2020

## DC Ekushey Alliance 2020 Member Organizations

Aamra Bangali Foundation, Inc.

American Association of Bangladeshi Engineers & Architectures (AABEA)

American Bangladesh Friendship Society (ABFS)

Bangladesh Association of America, Inc. (BAAI)

Bangladesh American Cultural Organization of DC (BACODC)\

Bangladeshi American Information Technology Professionals Organization, Inc. (BAITPO)

Bangladesh Association of Greater Washington, DC (BAGWDC)

Bangladesh Center for Community Development, Inc. (BCCDI)

Bangladeshi Entrepreneurs Society of Talents (BEST)

Bornomala Shikkhangon, Inc.

BUETianUSA Capital Region

Chitagoang University Alumni Forum, Inc. (CUAFI)

Dhaka University Alumni Forum, Inc. (DUAFI)

DHROOPAD, Inc.

Ekattor Foundation, Inc.

Friends & Family, DMV

Friends & Family, Inc.

Ichamati-A Friends & Family Union, Inc.

Jahangirnagar University Alumni Association in DC (JUAADC)

News-Bangla, Inc.

People N Tech Foundation, Inc.

Prio Bangla, Inc.

SHADESH Bangladesh, Inc.

# DC Ekushay Alliance 2020
# Program Management Sub-committee

**Event Co-Coordinators:**

Pryalal Karmakar
Anthony P. Gomes

**Event Advisory Committee (only ex DCEA coordinators)**

Mrs. Inara Islam
Dr. Shoaib Chowdhury
Dr. Arifur Rahman
Dr. Mizanur Rahman
Mr. Hiron Chowdhury
Mr. Shamim Chowdhury

**DCEA Standard Operation Procedure Guideline Creation Special Committee**

| | |
|---|---|
| Dr. Shoaib Chowdhury | - Chief Coordinator. |
| Dr. Mizanur Rahman | - Member |
| Dr Arifur Rahman | - Member. |
| Shamim Chowdhury | - Member. |
| Golam Mowla | - Member. |
| Saroj Barua | - Member. |
| Sarafat Hossain Babu | - Member. |
| Mosabber Zaman | - Member. |
| AR Swapan | - Member. |
| Shamsuddin Mohammed | - Member. |
| Pryalal Karmakar | - Member. |
| Safi Delwar Kajol | - Member. |
| Anthony Pius Gomes | - Member. |

**Cultural Sub-Committee/Coordinators**

| | |
|---|---|
| Dr. Mizanur Rahman | -Coordinator |
| Shafiqul Islam | -Co-coordinator |
| Dr. Arifur Rahman | -Member |
| Kalpana Chowdhury | -Member |
| Abu Rumi | -Member |
| Dr. Ishrat Sultana | -Member |
| Akter Hossain | -Member |
| Shumi Chowdhury | -Member |
| Mitu Robeiro | -Member |
| Clements Gomes | -Member |
| Naser Chowdhury | -Member |

**Publication Committee:.**

| | |
|---|---|
| Anis Ahmed | – Chief Editor |
| Anthony Pius Gomes | – Editorial Board/Coordinator |
| Dr. Aminur Rahman | – Editorial Board |
| Dr. Shoaib Chowdhury | – Editorial Board |
| Sharafat Hossian Babu | – Editorial Board |
| Pryalal Karmakar | – Editorial Board |
| Shamsuddin Mohammed | – Editorial Board |

**Event Operation:**

| | |
|---|---|
| Damian Dias | -Coordinator |
| Mahfuzur Rahman | -Co-Coordinator |
| Suman C. Karmakar | -Member |
| Sumit Mistry | -Member |
| Tito Morshed | -Member |

**Budget and Account Management**

| | |
|---|---|
| Mahfuzul Islam Bhuian | - Coordinator |
| Suman C. Karmakar | - Co-Coordinator |
| Sanjit Saha | - Member |

**Reception Management and Front Desk**

| | |
|---|---|
| Sam Ria | - Coordinator |
| Nusrat Jahan | - Co-Coordinato |

**Organization Registration and Review Committee:**

| | |
|---|---|
| Khairuddin Farhad | Coordinator |
| Shamsuddin Mohammed | -Member |
| Abu Sarkar | -Member |

**Audio-Visual Presentation Team:**

| | |
|---|---|
| Shafiqul Islam | - Coordinator |
| K Khan Linkoln | -Coordinator |
| Andrew Biraj | -Member |
| Taufique Hasan | |

**Sound Engineer:**

| | |
|---|---|
| Jamil Khan | -Chief Sound Engineer |

**Stage Management Team**

| | |
|---|---|
| Mahfuzur Rahman | -Co-Coordinator |
| Danial Kuddus | -Co-Coordinator |
| Hiron Chowdhury | -Member |
| Nur Mohammed Liton | -Member |
| Tariqul Islam Osru | -Member |
| Dilshad Chutty | -Member |
| Sadeq Chowdhury | -Member |
| Pradip Ghosh | -Member |
| Tito Morshed | -Member |
| Christopher Tapash Gomes | -Member |

**Stage Decoration Management team**

| | |
|---|---|
| Kachee Khan | –Coordinator. |
| Damian Dias | -Members |
| Nazmul Ahsan | -Members |
| Pradip Ghosh | -Members |
| Suman Chowdhury | -Members |
| Tehsin Ali | -Members |

**Organizations Floral Sequential Segment Management Team:**

| | |
|---|---|
| Jibak Barua | -Co-Coordinator |
| Sharafat Hossain Babu | -Co-Coordinator |
| Arshad Ali Bijoy | -Members |

| | |
|---|---|
| Danial Kuddus | -Members |
| Aman Ullah | -Members |
| Dastogir Jahangir | -Members |
| MD Altaf | -Members |
| AR Rahman Sawpan | -Members |
| Golam Mowla | -Members |
| Mahfuzul Bhuian | -Members |
| Shamsuddin Mohammed | -Members |
| Habib Bhuiyan | -Members |
| Nur Mohammed | -Members |
| Saroj Barua | -Members |
| Suman C. Karmakar | -Members |
| Sumit Mistry | -Members |
| Munir Chowdhury | -Members |
| Aktar Hossain | -Members |
| Md. Moznu Miah | -Members |
| Mohammed Khaled | -Members |
| Hasnath Sany | -Members |
| Abu Sarker | -Members |

**Presenter for Floral Presentation Segment:**

| | |
|---|---|
| AR Rahman Sawpan | -Members |
| Naieem Bappy Rahman | -Members |

**Floral Management Team:**

| | |
|---|---|
| Syeda Abdin | -Coordinator |
| Dilshad Chutty | -Members |
| Nusrat Jahan | -Members |
| Hasnat Sany | -Members |
| Naznin Aktar | -Members |

**Special Guest Management Team:**

Pryalal Karmakar
Anthony Pius Gomes
Damian Dias

**Vendor Management Team**

| | |
|---|---|
| Nur Mohammed | -Coordinator |
| Suman C. Karmakar | -Co-Member |
| Jibak Barua | -Members |
| Shamsuddin Mohammed | -Members |

**Multicultural Participation Team:**

| | |
|---|---|
| Pryalal Karmakar | - Coordinator |
| Habibullah Bhuiya | -Members |

**Mainstream Guest Liaison**

Pryalal Karmakar
Anthony Pius Gomes
Mohammed Rashid

**Venue and Technical Coordination Team**

| | |
|---|---|
| Damian Dias | – Coordinator |
| Mahfusul Islam Bhuiyan | -Members |
| Nur Mohammed | -Members |
| Suman C. Karmakar | -Members |

**Social Networking and Promotion**

Anthony Pius Gomes
Rafiqul Islam Akash
Rajib Barua
Taufique Hassan
Zahid Rahman
Tareque Mehdi
Lubaba Rahman Churi

**Banners, Badge, Security Management:**

| | |
|---|---|
| Golam Mowla | - Coordinator |
| Saroj Barua | - Co-Coordinator |
| Sarwar Siddiqui | -Members |
| Tofael Ahmed | -Members |

**Website Requirement, Design and Development Team**

| | |
|---|---|
| Shamsuddin Mohammed | - Coordinator |
| Saifullah Khaled | -Members |

**Volunteers Management and Special Operation**

| | |
|---|---|
| Damian Dias | - Coordinator |
| Sanjit Saha | -Members |
| Salim Aktar | -Members |
| Rahitos Mandal | -Members |

**Photography:**

Rajib Barua
Dewan Biplab
Shamim Haider
Kachi Khan
Intekhaab Siddiquee
Kamrul Islam Kamal
Shaon Rahman
Taufique Hassan

**Multimedia/Video:**

Ariful Islam and NRB Connect TV Team
Rajib Barua
Emdad Sujon and AGS Team
Somoy Shumon
3 Star Multimedia Group
Lubaba Rahman Churi

**Event Coordinator Associates Management team:**

Sanjoy Barua
Karim Salauddin
Nurl Amin Nuru
Mosabber Zaman
Raihan Elahi
Z.I. Russel
Shibbir Ahmed
MD Alam
Mohammed (Shahan) Rahaman
AJM Hossain

# ডিসি একুশে এলায়েন্স (ডিসিএ)-২০২০ আয়োজিত

## "অমর একুশে" ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানমালা–

### "স্পষ্ট নয়ন"

**১. শিশু কিশোরদের পরিবেশনা- নৃত্য নাট্য: "দেখেছি মায়ের চোখে"**

সমন্বয়ক : ইশরাত সুলতানা মিতা, গ্রন্থনা ও কারিগরি সহযোগিতায় : শফিকুল ইসলাম
নৃত্য পরিচালনায় : মিতু রিবেইরো, মুক্তা বড়ুয়া ও মেহরোজ পারিশা
সঙ্গীত পরিচালনায় : নাসের চৌধুরী, রিচার্ড সরকার ও রুমানা সুমি চৌধুরী

**২. একজন জীবন্ত ভাষা সৈনিকের প্রত্যক্ষ্যদর্শী বিবরণে একুশে ফেব্রুয়ারি ঃ**

১৯৫২-এর আশে-পাশের দিনগুলির স্মৃতিচারণ- "ভাষা সৈনিকের দৃষ্টিতে"
সমন্বয়ক: মিজানুর রহমান, গ্রন্থনা ও কারিগরি সহযোগিতায় : শফিকুল ইসলাম
সংগীত পরিচালক: ক্লেমেন্টস গোমেজ
কবিতা আবৃত্তি: অদিতি সাদিয়া রহমান এবং ডঃ আমিনুর রহমান
অভিজ্ঞতার বিবরণ: মজহারুল হক
যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগিতায়: তবলা: পল গোমেজ, হারমোনিয়াম: ক্লেমেন্ট গোমেজ স্বপন, একর্ডিয়ান: আবু রুমি, বাঁশি : মোহাম্মেদ মাজিদ, মন্দিরায়: প্রিয়লাল কর্মকার, অকটোপেড: আরিফুর রহমান স্বপন এবং নাফি, গিটার: শুভ্র হাসান।

**৩. একুশে নাটক: শহীদের দৃষ্টিঃ**

সমন্বয়ক: নুসরাত শফিক সোমা । গল্প, গ্রন্থনা এবং পরিচালনায়: শফিকুল ইসলাম
অভিনয়ে: ক্লেমেন্টস গোমেজ, ডোরা গোমেজ, প্যাট্রিক গোমেজ, শহিদুল ইসলাম, কাইয়ুম খান, মিজানুর রহমান খান, শাহরিয়ার আবসার আবির, তিলক কর, আফরিন ফ্যান্সি, সাদাফ আহসান, শাহীনূর রহমান, তারিক হাবিব।
সার্বিক সহযোগিতায় : ড. সোয়েব চৌধুরী, শব্দ নিয়ন্ত্রণ এবং আলোক সজ্জায়: জামিল খান

**৪. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে আন্তর্জাতিক দলীয় নৃত্য:**

"লেট'স সেলিব্রেট দ্যা কালচারাল ডাইভার্সিটি"
নৃত্য পরিচালনায়: লরা অর্টিজ, মেক্সিান ড্যান্স ও মারিটজা ম্যানজো, সেন্ট্রো কালচারাল পেরু।

**৫. অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ।**

# DC Ekushey Alliance : 2010-2020

## Compiled by : Dr. Shoaib Chowdhury

In Washington DC area, various organizations used to observe Language Martyrs Day independently until 2009. On January 17, 2010, five Bangladeshi social, cultural and alumni organizations reached a unanimous decision and agreed to observe the 58th Mother Language Day (Amar Ekushey) on Saturday, February 20, 2010. The first meeting was attended by the representatives of Bangladesh Association of America Inc. (BAAI), Bangladesh Association of Greater Washington D.C. (BAGWDC), Bangladesh Center for Community Development Inc. (BCCDI), Dhaka University Graduates Alumni (DUGA) and Dhaka University Graduates Group (DUGG). They invited other local organizations to join in this effort. The journey started with "Joint Ekushey Observance 2010", then changed to "Joint Ekushey WDC" as group names. The group name finally changed to "DC Ekushey Alliance" or DCEA. Each of the organizations presented their own segment as part of a long program. The FIRST program was organized by the following groups and the leaders of the participating organizations were:

AABEA: President: Mr. Faisal Qader
BASHI: President: Mr. Anisur Rahman Khan
BAAI: President: Mrs. Inara Islam
BAGWDC: Mr. Mohammad Alamgir
DUGA: President: Mr. Moeen Chowdhury
DUGG: Convener: Dr. Shoaib Chowdhury

Since then, Amor Ekushey and International Mother Language Day is being observed by Greater Washington DC social and cultural organizations under the banner of DC EKUSHSY ALLIANCE (DCEA) annually. Participating organizations, program dates, venue information and Name of the coordinators from all the programs are given below. There were only 6 organizations in 2010 and in 2020, there are 23 organizations become part of DCEA. Organizations names are abbreviated for space limitations and keys are given at the bottom of the article.

**FIRST DCEA Program : 2010**
Coordinator : Mrs. Inara Islam
Date: Saturday, February 20, 2010
Venue: Thomas W. Pyle Middle School, Bethesda, Maryland
Organizations: AABEA, BASHI, BAAI, BAGWDC, DUGA, DUGG

**SECOND Program : 2011**
Coordinator : Dr. Shoaib Chowdhury
Date: Saturday, February 19
Venue: Gunston Theater, Arlington, Virginia
Organizations: BAAI, BAGWDC, BCCDI, BSWDC, DUGG, EKTARA, Ora Egaro Jon

**THIRD Program : 2012**
Coordinator : Dr. Shoaib Chowdhury
Date: Saturday, February 18
Venue: Gunston Theater, Arlington, Virginia
Organizations: AABEA, BAAI, BAGWDC, BCCDI, BSWDC, DUGG, Ora Egaro Jon

**FOURTH Program : 2013**
Coordinator: Mr. Shamim Chowdhury
Date: Saturday, February 23
Venue: Gunston Theater, Arlington, Virginia
Organizations: BAAI, BAGWDC, BCCDI, BSWDC, DUAFI
PeopleNTech Alumni Association, Prio Bangla

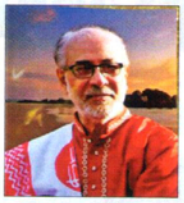

**FIFTH Program : 2014**
Coordinator: Dr. Shoaib Chowdhury
Date: Friday, February 21
Venue: Thomas Jefferson Middle School, Arlington, Virginia
Organizations: AABEA, BAAI, BAGWDC, BCCDI, DUAFI, Dhroopad

**SIXTH Program : 2015**
Coordinator: Dr. Arifur Rahman
Date: Saturday, February 28 (Scheduled on 21st, Changed due to snowstorm)
Venue: Laurel Hill Elementary School, Lorton, Virginia
Organizations: AABEA, BAAI, BAGWDC, BCCDI,
Bornomala Shikhangon, CUAFI, DUAFI, Prio Bangla, Shadesh Bangladesh

**SEVENTH Program : 2016**
Coordinator: DUAFI under the leadership of Dr. Mizanur Rahman
Date: Saturday, February 20
Venue: Margaret Schweinhaut Senior Center, Silver Spring, Maryland
Organizations: AABEA, BAAI, BACODC, BAGWDC, BCCDI, Bornomala Shikhangon
CUAFI, DUAFI, Dhroopad, Prio Bangla, Shadesh Bangladesh

**EIGHT Program : 2017**
Coordinator: Dr. Mizanur Rahman
Date: Saturday, February 18
Venue: Thomas Jefferson Middle School, Arlington, Virginia
Organizations: Aamra Bangali Foundation, AABEA, BAAI, BACODC BAGWDC,
BCCDI, Bornomala Shikhangon, CUAFI,
DUAFI, Dhroopad, News Bangla, Prio Bangla, Shadesh Bangladesh, Shristee Nrittyangon

**NINTH Program : 2018**
Coordinator: Dhroopad under the leadership of Mr. Hiron Choudhury
Date: Saturday, February 24
Venue: Gunston Theater, Arlington, Virginia
Organizations: Aamra Bangali Foundation, AABEA, BAAI, BACODC, BAGWDC,
BCCDI, BAIPO, BEST, Bornomala Shikhangon, CUAFI, DUAFI, Dhroopad, EKTARA
News Bangla, Ora Egaro Jon, PeopleNTech Foundation, Prio Bangla, Shadesh Bangladesh

**TENTH Program : 2019**
Coordinator : CUAFI under the leadership of Mr. Shamim Chowdhury
Date: Saturday, February 23
Venue: Kenmore Middle School, Arlington, Virginia
Organizations: Aamra Bangali Foundation, AABEA, BACODC, BAAI, BAGWDC,
BCCDI, BAIPO, BEST, Bornomala Shikhangon, CUAFI, DUAFI, Dhroopad,
Friends and Family D.M.V., Friends and Family, JUAADC, News Bangla,
PeopleNTech Foundation, Prio Bangla, Shadesh Bangladesh

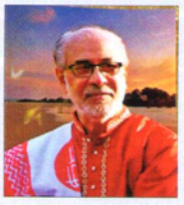

## ELEVENTH Program : 2020

Coordinator: Prio Bangla under the leadership of Mr. Pryalal Karmakar and Mr. Anthony Pius Gomes
Date: Saturday, February 22
Venue: Thomas Jefferson Middle School, Arlington, Virginia
Organizations: Aamra Bangali Foundation, AABEA, ABFS,
BAAI, BACODC, BAGWDC, BCCDI, BAIPO, BEST, Bornomala Shikhangon,
BUETianUSA Capital Region, CUAFI, DUAFI, Dhroopad,
Ekattor Foundation, Friends and Family D.M.V., Friends and Family,
Ichamoti, JUAADC, News Bangla,
PeopleNTech Foundation, Prio Bangla, Shadesh Bangladesh.

**Abbreviations :**

AABEA : American Association of Bangladeshi Engineers and Architects
ABFS : American Bangladesh Friendship Society
BAAI : Bangladesh Association of America, Inc.
BACODC : Bangladesh American Cultural Organization DC
BAGWDC : Bangladesh Association of Greater Washington DC
BASHI : Bangladesh American Society of Humanity Inc.
BCCDI : Bangladesh Center for Community Development, Inc. (Bangla School)
BAIPO : Bangladeshi American Intellectual Property Organization
BEST : Bangladeshi Entrepreneurs Society of Talents
BSWDC : Bangladesh Society of Washington, DC
CUAFI : Chittagong University Alumni Forum Inc.
DUAFI : Dhaka University Alumni Forum Inc.
DUGA : Dhaka University Graduates Alumni
DUGG : Dhaka University Graduates Group
Ichamoti-A Friends and Family Union, Inc.
JUAADC : Jahangirnagar University Alumni Association in DC

(The author was involved with DCEA activities from the very beginning and coordinated DCEA programs three times. Part of this information copied from the DCEA 2018 magazine, which was also compiled by the same author).

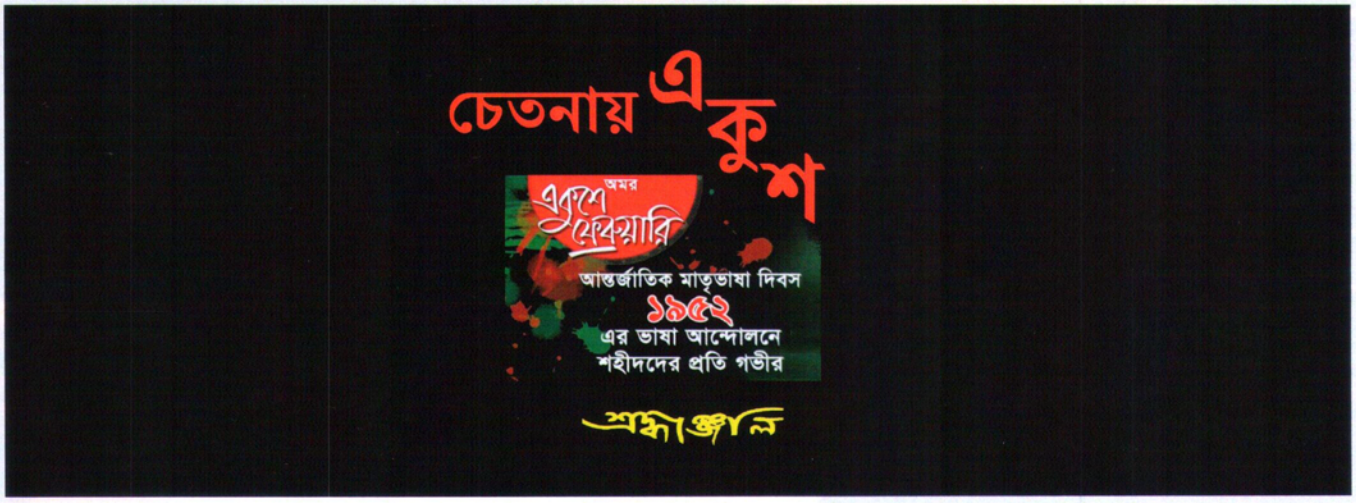

# একুশে ফেব্রুয়ারি
# বাঙালির মুক্তি চেতনার ইতিহাস

(সংকলনে : এ্যান্থনী পিউস গোমেজ)

## ভূমিকা :

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে ও ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শোকাতুর স্মারক দিবস মহান একুশে ফেব্রুয়ারি; রক্ত ঝরানো এই দিনে বাংলাকে তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ আরো অনেকে নিহত হন। ইতিহাসের পাতায় অমর অক্ষয় হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন আমাদের ভাষাশহীদরা, ইতিহাস এসব ভাষাশহীদকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে চিরকাল। কারণ তাঁদের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি সমগ্র বাঙালি জাতিকে মুক্তির চেতনায় উদ্দীপ্ত করেছে, যার পথ ধরে সময়ের পরিক্রমায় জন্ম নিয়েছে স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন, এসেছে গণ অভ্যুত্থান, বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তিযুদ্ধে, ছিনিয়ে এনেছে ভাষার স্বাধীনতা, দেশের স্বাধীনতা, জনগণের স্বাধীনতা। তাই ভাষা আন্দোলনই মূলত: বাঙালি জাতির মুক্তিচেতনা উন্মেষের সূতিকাগার। বাঙালির মননে, জাতীয় জীবনধারায় অনন্য মহিমায় ভাস্বর, চিরস্মরণীয় মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। বায়ান্নর একুশে ভাষার জন্য শহীদ হয়ে বাঙালি জাতি প্রথম প্রমাণ করে দিয়েছিলো ভাষার জন্য রক্ত দেওয়া যায় এবং তা ভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে দেয় অদম্য শক্তি এবং অয়োময় প্রত্যয়ের প্রেরণা। একুশে প্রত্যয়দীপ্ত একটি দিন বা তারিখই শুধু নয়, স্বাধীনতার সোপান, জাতীয় মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শের বাতিঘর। বায়ান্ন পর্যন্ত একুশ ছিলো আত্মত্যাগ পর্বের প্রস্তুতিপর্ব; আর বায়ান্নর পরের একুশ ছিলো স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্দীপ্ত হওয়ার পথে প্রেরণার উৎস। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পূরণ হলে একুশের আন্দোলন স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত হয়। বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ– এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও নবজাগরণের প্রতিটি মাইলফলকে ভাষা আন্দোলনের চেতনাই বারবার প্রেরণা, দুরন্ত সাহস ও শক্তি জুগিয়েছে বাঙালি জাতিকে। এসব প্রয়াস-প্রচেষ্টার পথ ধরেই চূড়ান্তভাবে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরে মহান বিজয় সূচিত হয়েছে, জন্ম নিয়েছে ভাষার গর্বে গর্বিত একটি দেশ, 'বাংলাদেশ'।

## চেতনার বহ্নিশিখা এবং আন্দোলনের সূত্রপাত :

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে ঘটেছিলো বাঙালি জাতির ইতিহাস পাল্টে দেওয়ার ঘটনা। ''বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা'', "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই", "তোমার ভাষা আমার ভাষা, বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা"... ইত্যাদি স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিলো ঢাকার রাজপথ, কেঁপে উঠেছিলো বাংলার মাটি, জেগে উঠেছিলো বাংলার দামাল ছেলেরা। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেন বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারসহ অনেকেই। একুশের ভাবধারা প্রথমদিকে ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে তা দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণকেও আপ্লুত করে। একুশের চেতনা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং নিপীড়িত মানুষের প্রতি সম্মানবোধকে জাগিয়ে তুলেছিলো। ইতিহাস বলে ভাষার প্রশ্নে একুশের আন্দোলন হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তা ছিলো শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ। সেদিন আত্ম-অধিকার, সমতাভিত্তিক সমাজ আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্নে জেগে উঠেছিলো তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। একুশের আন্দোলনেই ঘটে বাঙালির আত্মবিকাশ, যার ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে এসেছে মহান স্বাধীনতা।

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে অস্বীকার করে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে। প্রতিবাদে সোচ্চার হন বাংলার বুদ্ধিজীবীরা। বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম-অন্বেষায় যে ভাষাচেতনার উন্মেষ ঘটে, তারই সূত্র ধরে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভাষা-বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি সদস্যদের বাংলায় বক্তৃতা প্রদান এবং সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইংরেজিতে প্রদত্ত বক্তৃতায় বাংলাকে অধিকাংশ জাতিগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে উল্লেখ করে ধীরেন্দ্রনাথ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবি তোলেন। এছাড়াও সরকারি কাগজে বাংলা ভাষা ব্যবহার না করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান তিনি। ১৯৪৮ সালের মার্চে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন হয় এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তার চরম প্রকাশ ঘটে। বায়ান্নর ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের যে প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়, তার তাৎক্ষণিক তাৎপর্য মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু কাল পরিক্রমায় এর তাৎপর্যের পরিধি বিস্তৃত হয়। বায়ান্নর ২১ ফেব্রুয়ারির আত্মত্যাগ ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬ ও ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানে এক নতুন প্রত্যয় ও প্রতীতি দান করে। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে একুশের চেতনাই ছিলো প্রাণশক্তি। ২১ ফেব্রুয়ারির

অসীম তাৎপর্যপূর্ণ এই ঘটনা মূলত: আমাদের সার্বিক জাগরণের উৎসমুখ, আন্দোলনের শেকড়– এতে সন্দেহ নেই। একুশের চেতনা কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষভাবে অনুপ্রেরণার সঞ্চারী হিসেবে অন্তরে অনির্বাণ শিখা হয়ে জ্বলে উঠেছে বাঙালির অন্তরে।

## ভাষাশহীদদের রক্তে রঞ্জিত ঢাকার রাজপথ:

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তানের উদ্ভব হয়। কিন্তু পাকিস্তানের দু'টি অংশ– পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে অনেক মৌলিক পার্থক্য বিরাজ করছিলো। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ ঘোষণার প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী বাংলাভাষী সাধারণ জনগণের মধ্যে গভীর ক্ষোভের জন্ম হয় ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তান অংশের বাংলাভাষী মানুষ অন্যায্য এ সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি। ফলস্বরূপ বাংলা ভাষার সমমর্যাদার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতিদানে প্রকাশ্য অস্বীকৃতি পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের জাতীয়তাবাদী চেতনার মর্মমূলে হানে আঘাত। ১৯৪৮ সালেই গড়ে উঠে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। সে বছরের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দম্ভভরে উচ্চারণ করেন, 'উর্দু, কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' প্রতিবাদের ঝড় ওঠে বাংলাজুড়ে। শুরু হয় ভাষার জন্য বাঙালির প্রাণপণ সংগ্রাম। ১৯৫২ সালে আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠলে শাসকগোষ্ঠী নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভা থেকে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। বেলা ২টার দিকে আইন পরিষদের সদস্যরা আইনসভায় যোগ দিতে এলে ছাত্ররা তাদের বাধা দেয়। কিন্তু পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে, যখন কিছু ছাত্র সিদ্ধান্ত নেয় তারা আইনসভায় গিয়ে তাদের দাবি উত্থাপন করবে। ছাত্ররা ঐ উদ্দেশ্যে আইনসভার দিকে রওনা হলে বেলা ৩টার দিকে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়; শহীদ হন আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার, আব্দুস সালাম, শফিউর রহমান, রিকশাচালক আবদুল আউয়ালসহ আরো অনেকে। ছাত্রমিছিলে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে ঢাকার রাজপথ। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সমবেত হয়। নানা নির্যাতন সত্ত্বেও ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি পুনরায় রাজপথে নেমে আসে। ২২ ফেব্রুয়ারিও ঘটে গুলি বর্ষণের ঘটনা। রক্তাক্ত হয় পূর্ব বাংলার মাটি, ঢাকার রাজপথ।

## মহান ভাষাশহীদদের স্মৃতিস্মরণস্তম্ভ– শহীদ মিনার:

ভাষাশহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ, যা সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি গুঁড়িয়ে দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারির এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন আরো বেগবান হয়। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে ৯ মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তখন থেকে প্রতি বছর এ দিনটি জাতীয় 'শোক দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়।

প্রথম শহীদ মিনারটি তৈরি হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র হোস্টেলের (ব্যারাক) বার নম্বর শেডের পূর্ব প্রান্তে, কোণাকুণিভাবে হোস্টেলের মধ্যবর্তী রাস্তার গা ঘেঁষে। উদ্দেশ্য ছিলো যাতে বাইরের রাস্তা থেকে সহজেই দেখা যায় এবং যে কোনো ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে ভেতরের লম্বা টানা রাস্তাতে দাঁড়ালেই যেন চোখে পড়ে। ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে শহীদ শফিউরের পিতা অনানুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে দশটার দিকে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। উদ্বোধনের দিন অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী মেডিকেলের ছাত্রদের আবাসিক হোস্টেল ঘিরে ফেলে এবং প্রথম শহীদ মিনার ভেঙে ফেলে। প্রথম শহীদ মিনারটি ভেঙে ফেলার ২ বছর পর ১৯৫৪ সালে নিহতদের স্মরণে নতুন একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। ১৯৫৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতায় বড় পরিসরে শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু করা হয়। নতুন শহীদ মিনারের স্থপতি ছিলেন হামিদুর রহমান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল চত্বরে বড় আকারের এই স্থাপনাটি নির্মাণ করা হয়। মূল বেদীর উপর অর্ধ-বৃত্তাকারে সাজানো ৫টি স্তম্ভের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, মা তাঁর শহীদ সন্তানদের সাথে দাঁড়িয়ে আছেন। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের কারণে স্থাপনাটির নির্মাণ কাজের অগ্রগতি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আবুল বরকতের মা হাসনা বেগম শহীদ মিনারটির উদ্বোধন করেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী এটি ভেঙে দেয়। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার এটি পুনরায় নির্মাণ করে। ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বায়ান্নর ভাষাশহীদদের শোকাবহ স্মৃতির চিহ্ন, জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ– আমাদের শহীদ মিনার!

## একটি লাশ, একটি কবিতা– "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি":

একুশের প্রভাতফেরীতে যে কালজয়ী মর্মস্পর্শী গানটি গাইতে গিয়ে আমাদের ধমনীতে বয়ে যায় শহীদদের রক্তের স্পর্শ, তার সৃষ্টির ইতিহাসও অনেক মর্মন্তুদ। একুশে ফেব্রুয়ারিতে গুলিবিদ্ধ রফিকের লাশ নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, যেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কবি-কথাশিল্পী আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রফিকের মরদেহ দেখেছিলেন। ৫২'র ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ তিনি। সেসময় ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বলেন, "আমি আরো দুজন বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজের আউটডোর কক্ষে। সেখানে বারান্দায় শহীদ রফিকের লাশ ছিলো– মাথার খুলিটা উড়ে গিয়েছিলো!" রফিকের মরদেহ দেখে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মনে হয়েছিলো, যেন তাঁর নিজের ভাইয়ের লাশ পড়ে আছে। তখনই তাঁর মনে গুনগুনিয়ে ওঠে সেই কালজয়ী কবিতা– ''আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি"। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর বর্ণনায়– "এই কবিতায় প্রথমে আব্দুল লতিফ সুর দেন, কিন্তু তার পরে আলতাফ মাহমুদ সুর দেন।" আলতাফ মাহমুদের সুরেই এটা প্রভাতফেরীর গানরূপে গৃহীত হয়। আজো আমরা প্রভাতফেরীতে, আয়োজিত

একুশের অনুষ্ঠানে গেয়ে যাই সেই কালজয়ী গান, আমাদের শিরার শিরায় বয়ে চলে ভাষাশহীদদের প্রতি পরম কৃতজ্ঞতার বেদনাতুর ধ্বনি।

## '৫২-এর একুশ আজ "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস":

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির যে চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে বাঙালিরা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো, আজ তা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। কানাডার ভ্যানকুভার শহরে বসবাসরত দুই বাঙালি– রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালাম প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানিয়েছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসঙ্ঘের সদস্য দেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে এখন থেকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করবে জাতিসংঘ– এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বদৌলতে আজ শোভা পাচ্ছে আমাদের ঐতিহ্যময় শহীদ মিনারের চিত্র। দেশপ্রেমিক বাঙালি মাত্রই এ চিত্র দেখে স্বদেশের গর্বে গর্বিত হবেন। একই সাথে সেখানে এই দিবসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ভূমিকাও উল্লেখিত আছে।

## একুশের মুক্তি চেতনা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট:

স্বাধীনতা লাভের পরও একুশ বিভিন্ন সংকট-সন্ধিক্ষণে জাতিকে জাগ্রত করতে চেতনাদায়ী প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। একুশের বইমেলা সে ধরনের একটি উপলক্ষ্য, যা বাঙালি জাতিকে এক অনবদ্য ঐক্যে, সৃজনশীল সাংস্কৃতিক আবহে উদ্বুদ্ধ করেছে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন এখন আর কোনো একপক্ষীয় দাবি বা কর্মসূচি নয়, বাংলা ভাষা এবং এর সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধকরণ সবার সম্মিলিত প্রয়াস-প্রচেষ্টার প্রতিফলন। 'একুশ মানে মাথা নত না করা', একুশ তাই বাঙালির মুক্তি চেতনার প্রতীক। একুশের শহীদদের ঠাঁই এখন প্রতিটি বাঙালির মর্মমূলে... পরম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় উচ্চারিত হয় প্রতিটি শহীদের নাম। মহান ভাষাশহীদদের স্মরণে সারাদেশে, অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বিদেশে যেখানেই রয়েছে বাঙালি, সেসব অনেক জায়গায়ই গড়ে উঠেছে বাংলার অহংকারের প্রতীক শহীদ মিনার। একুশে তাই আত্মত্যাগের অহংকারে ভাস্বর মহান একটি দিন, দেশমাতৃকার প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করার শপথ গ্রহণের দিন। একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষাশহীদদের স্মরণে 'জাতীয় শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বাংলাদেশ ও সারাবিশ্বে পালিত হচ্ছে নানা আনুষ্ঠানিকতায়।

বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা, আমাদের মুখের ভাষা– আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার! বাংলাদেশ আমাদের প্রাণের জন্মভূমি, আমাদের অস্তিত্বের শেকড়... আর একুশ আমাদের মুক্তি চেতনার উৎস!
সকল ভাষাশহীদের চরণে আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি!!!


NRB CONNECT

FIRST EVER BANGLADESHI AMERICAN TELEVISION FROM DMV, USA

FOR NEWS, EVENT AND ANY TYPE OF CREATIVE PROJECT

PLEASE CONTACT US

703-401-6292

tvnrbconnect@gmail.com

Studios

Tysons Corner Virginia , USA
Astoria, Newyork USA
Panthapath , Dhaka, Bangladesh.

# পরাধীন ব্রিটিশ ভারতে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রথম দাবী

## ডঃ আবদুন্ নূর

০১

আবহমানকাল হতে প্রতিটি প্রাচীন মুখের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে আপন ভাব ও চিন্তার প্রসারের চেতনায়। ভাষা প্রচলিত হয়েছে দেশ হতে দেশান্তরে সম্রাজ্যের সীমারেখা পরিবর্তনে, বাণিজ্যের বিস্তারে, জাতিগত মূল্যবোধ ও স্বীকীয়তা নিয়ন্ত্রণে। আধুনিক কালে ভাষা নিয়োজিত হয়েছে দেশগত জাতীয়তাবাদ নির্ধারণে। কিন্তু কদাচিত ভাষা হাতিয়ার হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার নীতি প্রসারে।

বহমান সভ্যতার অগ্রসরতা ভূমণ্ডলের প্রতিটি ভৌগলিক অবস্থানে। গত পাঁচ হাজার বছর ধরে পর্যালোচনা করলে হয়তো অনুধাবন করতে পারবো প্রতিটি আর্ন্তজাতিক ভাষা বাহক হয়েছে আন্তদেশ বাণিজ্যের ও সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারে। কিন্তু হয়নি সাম্প্রদায়িকতা প্রসারের হাতিয়ার। প্রতিটি আন্তজার্তিক ভাষা দায়িত্বশীল থেকেছে প্রতিটি দেশে নিজ নিজ মুখের ভাষাকে নিজ নিজ দেশের সংহতির লক্ষে।

০২

ভারত বিভাগের এক যুগ আগে, দ্বিতীয় মাহাযুদ্ধের প্রক্কালে, ভারতের প্রবীণ রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ মনে মনে নিশ্চিত হয়েছিলেন তাঁদের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন অবশ্যই সফল হবে। ব্রিটিশ সহসা ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এবং ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বাধীন ভারতের নেতাদের ওপর সহসা ন্যস্ত করতে উদগ্রীব হবে। ভারত স্বাধীন হবে সত্বর। এই প্রত্যাশা ভারতের আপামর জনসাধারণের মনে ও চেতনায় জেগে ওঠার আগেই সেই সময়ের প্রবীন ভারতীয় নেতারা হয়ে পড়লেন একটি ভারতীয় ভাষাকে দেশময় প্রচার ও প্রসারের প্রবক্তা। হঠাৎ করেই। ইংরেজ ভারত ছাড়বে। কিন্তু সাথে সাথে ইংরেজি ভাষা স্বাধীন ভারত হতে উধাও হবে না সেই উপলব্ধি তাঁদের ছিলো। কিন্তু তারা এও বুঝেছিলেন একটি ভারতীয় ভাষার আধিপাত্য সমগ্র ভারতীয় জনগণের ওপর না রাখতে পারলে নানাবিধ রাজনৈতিক পরিবর্তন আসন্ন হতে পারে।

কংগ্রেসের তদানীন্তন কিছু উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ আসন্ন স্বাধীন অখণ্ড ভারতে একটি ভাষা ও একটি বর্ণমালা প্রচলনের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ওরা খুঁজছিলেন ভারতের একটি প্রচলিত ভাষাকে। যেই ভাষায় ভারতের সবচেয় বেশী জনগণ পরিচিত। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। যেই ভাষা ভারতের প্রধান প্রধান শহরে প্রচলিত ও বাণিজ্যের মাধ্যম। যেই ভাষায় সুন্দর ও সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। যেই ভাষা ভারতের প্রতিটি জাতির প্রতি শ্রাদ্ধাশীল। এই নিরিখে দাবীদার হতে পারতো সেই সময় তিনটি বহুল প্রচলিত ভাষা। হিন্দী, উর্দু ও বাংলা।

০৩

ভারতের বুদ্ধিশীল সমাজে সমগ্র ভারতের রাষ্টভাষা কি হবে এবং কেন হতে পারে সেই সব যুক্তিগুলোর নিষ্ঠা পর্যালোচনা হবে সেই আস্থা ছিল। বুদ্ধিজীবি মহল নিশ্চিত ছিলেন যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সমগ্র স্বাধীন ভারতের রাষ্টভাষার ব্যাপারে ধৈয্যশীল হবেন। এবং কোন হঠকারী সিধান্ত বুদ্ধিজীবি মহলকে উপেক্ষা করে নেবেন না। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পক্ষ হয়ে মহাত্মা গান্ধী হঠাৎ ঘোষণা করেন হিন্দী হবে সমগ্র স্বাধীন ভারতের রাষ্টভাষা। পাল্টা দাবী সাথে সাথে পেশ হলো উর্দুর পক্ষে। দুটো ভাষার দাবীর সপক্ষে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রাধান্য দেয়া হলো।

মহাত্মা গান্ধী বয়ান করলেন স্বাধীন ভারতের রাষ্টভাষা হবে " হিন্দুস্থানী"। সেই ভাষা দেবনাগরী বর্ণমালয় লেখা হলে সেই ভাষা গণ্য হবে "হিন্দী" হিসেবে। আরবী বর্ণমালায় লেখা হলে গণ্য হবে " উর্দু" হিসেবে। মহাত্মা গান্ধীর ঘোষণা আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক সুবিধাজনক। কিন্তু অবশ্যই কার্যক্ষেত্র পরস্পর বিরোধী ও অসংগ্নক। "হিন্দুস্থানী" কথ্য ভাষা হবে সমগ্র ভারতের। কিন্তু লেখার ও সাহিত্যের ভাষা হবে "হিন্দী" দেবনাগরী লিপি অনুসারীদের জন্যে। আরবী হরফ অনুসারীদের জন্যে লেখা ও সাহিত্যের ভাষা হবে "উর্দু"। সাম্প্রদায়িকতার নীতি কংগ্রেসের ঘোষণার উহ্য থাকলেও গান্ধীজীর ভাষা ফর্মুলায় সাম্প্রদায়িকতাকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে।

০৪

ভারতের প্রতিটি প্রদেশে ও মহলে নানাবিধ মতামত প্রকাশিত হলো। কিছু লেখা হিন্দী ভাষার অনুকূলে ও প্রতিকুলে। কিছু লেখা উর্দু ভাষার প্রতিকূলে ও অনুকূলে। কিন্তু প্রায় প্রতিটি লেখায় রেশ রয়েছে সাম্প্রদায়িকতার। হিন্দী হিন্দুর পক্ষে। উর্দু মুসলিমের পক্ষে। সেই বিবাদে অনুপস্তিত অন্যান্য সাম্প্রদায়িক মহল। খ্রীস্টান। বৌদ্ধ। জৈন। শিখ। যুক্তি তর্কগুলো উপস্থাপিত হয়েছিল ধর্মভিত্তিক। হিন্দু লেখক হিন্দীর পক্ষে। মুসলিম লেখক উর্দুর পক্ষে।

০৫
সেই বিভাজিত পরিপ্রেক্ষিতে, সমগ্র বাংগালী জাতির পক্ষে, বাংলা ভাষাকে অসাম্প্রদায়িক ঘোষণা করে হিন্দী ও উর্দু ভাষার পরিবর্তে, অখণ্ড ভারতের রাষ্টভাষা হিসাবে গ্রহণ করার দবী পেশ করে দৈনিক আজাদ পত্রিকা। ১৯৩৭ সালের ২৩ শে এপ্রিলে " ভারতের রাষ্টভাষা" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে কলকাতা হতে প্রকাশিত দৈনিক আজাদ। সেই দীর্ঘ সম্পাদকীয় তুলে দরে ভারতের জনসমক্ষে বাংলা ভাষাকে সমগ্র ভারতের রাষ্টভাষা গ্রহণের নানাবিধ তীর্যক যুক্তি। বাংলা ভাষা শত সহস্র বছর ধরে সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে থেকে ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তারে সক্ষম থেকেছে। বাংলা ভাষা আগামীতেও ভারতে প্রতিটি সম্প্রদায়ের মিলন ভাষায় পরিগণিত হওয়ায় সক্ষমতা ধরে আছে।

০৬
১৯৩৭ সালের বাংলার সমাজকে পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে দৈনিক আজাদের যুগান্তকারী এই সম্পাদকীয় কতোটা গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদকীয়টি পূর্ণ উদ্বৃত হয়েছে অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক সম্পাদিত "একুশের দলিল" পুস্তকে। এবং ইতিহসের মোড় ধারায় বাংলা ভাষার অবদান কতোটা তাৎপর্যমূলক। বাংলার পাঁচকোটি মানুষ বাংলায় কথা বলে ও বাংলায় রচিত সাহিত্য অনুধাবন করে। শিক্ষিতের হার বাংলায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বাংগালী পুরোধা। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার জয় করে সাহিত্য আন্তর্জাতিক স্বাকৃতি পেয়েছে। নজরুল তাঁর দুর্জয় লেখনী ও গানের মাধ্যমে বাংলার আপামর জনতার মন জয় কওে চলছে। ব্রিটিশ শাসনের অন্তিমকাল আসন্ন। দেশের ভার দেশের মানুষকেই নিতে হবে। ওরা বাংলায় কথা বলে শুধু বাংলায় নয়। বরং ভারতের কমপক্ষে দশটি প্রদেশে বাংলা বহুল প্রচলিত। ওরা বাংলা বোঝে। বাংলায় কথা বলতে পারে। ভাষার ব্যপাওে ওরা সবাই অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু অল্প কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। কিছু উচ্চবিত্ত শিক্ষিত অর্থবান হিন্দুরা বাংলার পরিবর্তে ইংরেজীতে কথা বলতে বেশী পছন্দ করেন। এবং একই সুতোয় কিছু মুসলিম পরিবার বাংলার পরিবর্তে উর্দুতে কথা বলার প্রবণতা ধরে রাখন। কিন্তু ওরা কেউ বাংলার বিপক্ষে নন।

০৭
গান্ধীজীর ভাষা ঘোষণা সেই পটে পরিবর্তন নিয়ে এলো। অথচ অভিজাত হিন্দু বাংগালী মহলে হিন্দীর ঘোষণা প্রতিবাদেও ঝড় বয়ে নিয়ে এলো না। বরং সেই ঘোষণা বির্বিচাওে মেনে নেয়ার সহনশীলতা পরিলক্ষিত হলো। বাংগালীর সমগ্র বৈশিষ্ট্য ক্রমে হিন্দী ভাষাভাষীর কাছে বিসর্জিত হবে সেই নিয়ে সংবাদপত্রে বা সাহিত্যে কোন আলোচনা ভেসে ওঠেনি। অন্যদিকে উচচবিত্ত বংগালী মুসলমান তাদেও উর্দু কথা বলার স্বাচ্ছন্দতাকে আপন কওে উর্দুকে অবলম্বন করতে তৎপর হলেন।
সজ্জন বংগালীর স্বাধনি চিন্তার কিছুটা উন্মোষ ঘটিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার সরকার। তিনি তাঁর বক্তব্যে কয়েকটি সূত্র বাংলা ভাষার পক্ষে তুলে ধরেছিরেন। (১) অবিভক্ত ভারত ভুখণ্ডে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাংলায় কথা বলে। (২) বাংলাভাষী সীমানা একদিকে মানভূম, সাওতাল পরগণা পুটিয়া ভাগলপুর। এবং অন্যদিকে শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, কাছার পর্যন্ত বিস্তৃত। (৩) আসামী, উড়িষ্যা ও অহমীয়া বাংলার শাখা ভাষা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। (৪) বাংলা লেখার রূপ সব অঞ্চলে এক, যদিও উচ্চারণে বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে বিভেদ রয়েছে। (৫) ভারতের সব প্রাদেশিক সাহিত্যেও চেয়ে বাংলা সাহিত্য শ্রেষ্ঠ। (৬) হিন্দী ভাষা ভারতে বিস্তৃত হলেও সাহিত্যে সেই ভাষার অবদান বাংলা ভাষার সমকক্ষ নয়।

০৮
প্রফুল্ল কুমার সরকারের যুদ্দিকগুলোকে দৈনিক আজাদ যুগান্তকারী সম্পাদকীয়তে পূর্ণ সমর্থন জানান। এবং সেই সাথে তিনটি মৌলিক যুক্তি বাংলা ভাষার সমর্থনে তুলে ধরেন।
ক. ভাষা কখনো কোনো কালে ধর্মকে প্রতিফলিত করে না। ভাষা মানুষের ভাষা। জনগণের ভাষা। কোন বিশেষ অতীতে ভাষা কোন বিশেষ ধর্মেও জণ্যে চিহ্নিত হয়নি। ভবিষ্যতেও অখণ্ড ভারতে ভাষাকে ধর্মেও হাতিয়ার হয়ে ব্যবহৃত হতে দেয়া অনুচিত।
খ. গান্ধীজি অখণ্ড ভারতের রাষ্টভাষা হিসেবে " হিন্দী হিন্দীস্থানী" প্রস্তাব সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে ত্বরান্বিত করছে। উভয় মহলের স্বার্থবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হিন্দুর জন্যে হিন্দী ও মুসলমানের জন্যে উর্দুও প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে ওদের নিজ নিজ প্রদেশে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের অপকৌশলে মেতে উঠেছে। ভারতের আপামর জনতা দ্বিধান্বিত ও অসহায় আকাংখায় আতঙ্কিত।
গ. বাংগালীকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে সোচ্চার হতে হবে। এই আশংকাজনক পরিস্থিতিতে বাংলাকে অখণ্ড ভারতে রাস্টভাষা হিসেবে গ্রহণের জন্যে বাংলার বুদ্ধিশীল সমাজ আরো যুক্তিময় দাবী কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে তুলে ধরবে। এবং সাথে সাথে বাংলার আপামর জনতাকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে বাংগালী তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হবে।

০৯
দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয়টি কে লিখেছেন সেই নিয়ে কোন তথ্য দেখতে পাইনি। হয়েতো সম্পাদকীয়টি সম্পাদক আকরাম খান নিজে লিখেছিলেন। হয়তো তার সহযোগী সাংবাদিকদের মাঝে হতে কেউ একজন লিখেছেন। যিনি লিখেছেন তিনি অবশ্যই আবাদের শ্রদ্ধার পাত্র যুগযুগান্তর ধরে। ততোধিক শ্রদ্ধার পাত্র সম্পাদক আকরাম খান। বংলা ভাষার পক্ষে তাঁর বলিষ্ঠ ভূলিকার জন্যে। লাহোর প্রস্তাব গহণের বহু বছর আগেই এই দূরদর্শী সাংবাদিক বাংলার সকল সচেতন শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি ও সাংবাদিকদেও একত্রীভূত কওে বাংলা ভাষার দাবীকে ভারতের রাজনৈতিক মহলে তুলে ধরেছিলেন। তিনি নির্ভীক। তিনি বরেন্য।

# বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সুদিন দুর্দিন

আনিস রহমান, পি.এইচ.ডি.

প্রথমেই আমি সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী এই বিষয় নিয়ে কিছু বলার জন্যে, কারণ জন্মসূত্রে বাঙ্গালী হওয়া ছাড়া ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি আমার তেমন কোনো অবদান নাই। কাজেই আমার বক্তব্য সুধীজনদের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তবুও আমার অনুভূতি প্রকাশের তাগিদ বোধ করি মাঝে মাঝে। আমি আরও ক্ষমা প্রার্থী এ জন্যে যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ট পরিচিত হওয়ার সুযোগটাও সীমিত। বাংলা ভাষাকে ভালবাসা জন্মগত ভাবে হলেও ভাষার সুদিন-দুর্দিন নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বা কর্তৃত্বপূর্ণ মন্তব্য করাটা আমার পক্ষে কিছুটা দুঃসাহসের ব্যাপার। তাই ব্যাপারটাকে আমি আমার মত করেই দেখার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের জন্যে ৫২'র ভাষা আন্দোলন, অমর একুশে, এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা– এ সবই ঘটেছে যেন একটা অমোঘ নিয়মানুযায়ী। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কোনো বিকল্প ছিল না। তেমনি, পরবর্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ারও কোনো বিকল্প ছিল না। স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম অবশ্যই সহজ ছিল না, কিন্তু ধাপে ধাপে সেটা ঠিকই এগিয়েছে সফল নেতৃত্বের কারণে এবং বাংলাদেশের জনগনের জীবন-মরণ প্রচেষ্টার কারণে। তবে কিছুটা নিরুৎসাহের ব্যাপার এই যে, বাংলা ভাষার অগ্রগতির ব্যাপারে ঠিক একই রকম কথা বলা যায় না।

বাংলা ভাষার বিশিষ্ট এবং কালজয়ী ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের সময়ে বাংলা ভাষা সূর্যের মত আলোকিত হয়েছিল এবং আজও সে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এটা মোটেই অত্যুক্তি নয় যে, বাঙ্গালীর সেই গর্বশিলিত আত্মমর্যাদাই জাতীকে বৃটিশ খেদাও থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেরণা এবং সাহস জুগিয়েছিল। সে বিচারে ওই যুগগুলো আবশ্যই বাংলা ভাষার সুদিন হিসাবে ভাবা যায়। কিন্তু ভাষার কাজ তো' কখনই শেষ হয় না। মানুষ শিশু থেকে এবং যুবক থেকে বৃদ্ধ হয়, তারপর একদিন চলে যায়। কিন্তু ভাষা চলতেই থাকে শত শত যুগ ধরে। ইতিহাসে যদিও অনেক ভাষাই বিলুপ্ত হয়ে গ্যাছে সেগুলোর ধারক-বাহক সভ্যতার সাথে সাথে– কিন্তু আমার বিচারে বাংলা ভাষা এখনও কৈশোর পেরোয়নি। মূল ভাষাকে যদি একটি বৃক্ষের সাথে তুলনা করা যায়, তবে সংস্কৃতি, বাণিজ্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান– সবকিছুই বৃক্ষের ডালপালার সাথে তুলনীয়।

*Figure 1: পৃথিবীর বহুল কথিত ভাষা সমূহের মধ্যে বাংলা ৬ষ্ট স্থানে [1].*

একটি জাতীয় ভাষা একটি দেশের জাতীয় পরিচয় বহন করে। ২০১৭ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলা ভাষা পৃথিবীর ৬ষ্টতম বহুল কথিত ভাষা (চিত্র নং ১)। কিন্তু ওই একই বছরের আরেকটি পরিসংখ্যানে ভাষাগুলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে– সেখানে প্রথম ১০টির মধ্যে বাংলার স্থান হয় নাই (চিত্র নং ২)।

স্বঃভাবতই প্রশ্ন জাগে, কিভাবে একটি ভাষা অন্য ভাষা থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ

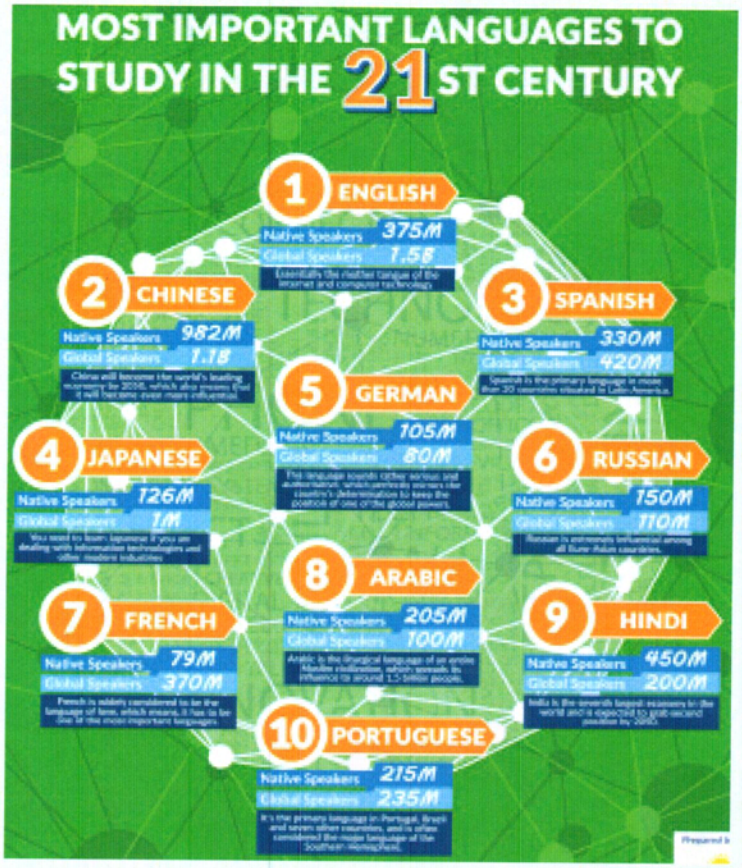


হয়? অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ের উপর একটি ভাষার গুরুত্ব নির্ভর করে?

ঐতিহাসিকভাবে, এর সহজ উত্তর হল, প্রধানত তিনটি বিষয় কোনো ভাষাকে গুরুত্ব প্রদান করে। প্রথমত, ভাষার সর্বমোট শব্দতালিকা বা ভোকাব্যুলারি; দ্বিতীয়ত, সেই ভাষার সাহিত্যের উৎকর্ষতা এবং তৃতীয়ত, উক্ত ভাষার সঙ্গে কোনো মহান সংস্কৃতি জড়িত থাকতে হবে।

তবে বর্তমান সময়ে শুধু ঐ ঐতিহাসিক বিষয়গুলির উপর নির্ভর করলেই চলবে না। কারণ, ইতিহাসের গতিতে সবকিছু নির্ধারিত করতে হলে বর্তমান নিয়ে চলা কঠিন হবে। সাহিত্য এবং সংস্কৃতি ছাড়াও একটি ভাষার ব্যবহারিক দিকগুলিও বিশেষ বিবেচ্য। প্রধান তিনটি ব্যবহারিক বিষয় হল, (১) ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আর্থিক লেনদেন– পৃথিবীতে ইংরেজী ভাষাতেই সর্বাধিক বাণিজ্য হয়ে থাকে; যে কারণে ডলার এবং পাউন্ড এখনও পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা হিসাবে রাজত্ব করছে। (২) বিজ্ঞান এবং গবেষণা– যে কোনো ভাষার একটি অন্যতম প্রধান কাজ হল জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের ধারক ও বাহক হওয়া। যে ভাষায় যত বেশী জ্ঞান চর্চা ও বিস্তার করা সম্ভব, তার গুরুত্ব তত বেশী। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও ইংরেজী ভাষার জয়জয়কার। ইংরেজীর তুলনায় অন্য ৮টি ভাষার তুলনামূলক পরিসংখ্যান ৩ নং চিত্রে দেখান হয়েছে ২০১১ পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, ওই ৮টি দেশই ইংরেজীর পাশাপাশী স্থানীয় ভাষাতেও প্রচুর প্রকাশনা করেছে। (৩) বিনোদন- এই বিনোদনের ব্যাপারে বাংলা বোধকরি সবচেয়ে বেশী এগিয়ে, উপরোক্ত অন্য দুইটি ব্যবহারিক বিষয়ের তুলনায়। এটিও বাংলা ভাষার একটি সুদিন।

Figure 1. Ratio of the number of journal articles published by researchers in English to those in the official language of eight different countries, 1996–2011 (Source: Scopus). [3].

এটা অনস্বীকার্য যে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে বাংলা ভাষায় (এবং পৃথিবীর সব ভাষায়ই) অনেক বেশী প্রকাশনা হচ্ছে। এর অনেক কিছুই গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা আবার অনেক কিছুই শুধু নিছক প্রকাশনার জন্যে। আমরা সবাই জানি, পরিমাণ দিয়ে মান যাচাই করা যায় না পরিমাণ কখনও মানের সমান হয় না। কিন্তু তারপরও ভাষা এবং তার প্রকাশনার ক্ষেত্রে পরিমাণটাও গুরুত্বপূর্ণ। আর প্রকাশনার প্রাচুর্যের কথা বলতে গেলে প্রযুক্তিকেও বাদ দেওয়া যায় না। এই যে চারিদিকে এত প্রকাশনার ছড়াছড়ি, প্রযুক্তির উন্নতি বর্তমান পর্যায়ে না এলে এটা কখনই সম্ভব হত না। প্রযুক্তির উন্নতির করণেই আজ আমরা "সামাজিক মাধ্যম" বা সোশাল মিডিয়ার সুবিধা পাচ্ছি। ১৯৮০র দশকে এই সোশাল মিডিয়া ছিল না। তখনকার সময়ে কম্পিউটার দিয়ে বাংলা বা অন্যান্য ভাষায় লিখতে পারাটাই একটা বড় ব্যাপার ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষা এ ব্যাপারেও অন্য অনেক ভাষা থেকে এগিয়ে ছিল। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ শুরু হওয়ার পর পরই কম্পিউটারে বাংলা প্রকাশনা তড়িঘড়ি করে প্রসার লাভ করে। ১৯৮৭ তে প্রথম উইন্ডোজ-এ বাংলা ফন্ট ব্যবহার শুরু হয় [৪] যা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইউনিভার্সিটি অব উইস্কোন্সীনঅশকশ এ বিভিন্ন কনফারেন্সে উপস্থাপন করা হয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১৯৮৭ এর বেঙ্গল স্টাডিজ কনফারেন্সে প্রথম

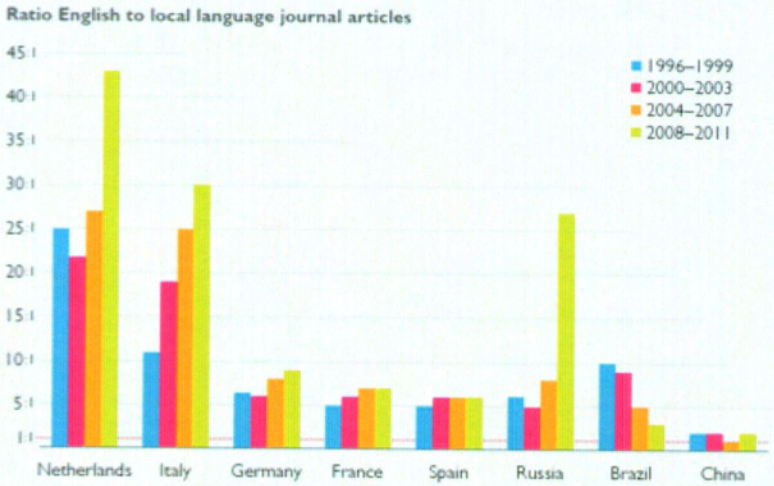

বাংলা সফটওয়্যার "সোনারগাঁও" [৫] এর কপি বাংলাদেশ থেকে আগত ডেলিগেটদেরকে দেওয়া হয়- তাঁদের মধ্যে সিরাজুল আলম খান, মরহুম ডঃ মাযহারুল ইসলাম, এবং আরো কয়েকজন ছিলেন যাঁরা তা বাংলাদেশে নিয়ে যান।

কাজেই, বাংলা ভাষার দুর্দিন নিয়ে আশংকিত হওয়ার কারণ নই। কিন্তু আশংকা এটাই যে বাংলা ভাষার যতটা উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার অনেক কিছুই বাস্তবায়ীত হচ্ছে না। ভাষা আমাদেরকে আরো অনেক কিছু দিতে পারে, আরো অনেক কিছু দেওয়ার সামর্থ্য তার রয়েছে- কিন্তু আমরা তা নিচ্ছি না, আমরা তার যথাযথ ব্যবহার করছি না। এটা একটা অপচয়; একটা বিশাল অপচয়। তো' ভাষা আমাদেরকে আর কি দিতে পারে? একটি দেশের বা জাতীর যা কিছু মহান এবং যা কিছু বৃহৎ, ভাষাই তার একমাত্র বাহক। সুতরাং বাংলা ভাষা যুগ যুগ ধরে আমাদেরকে আরো বৃহৎ এবং মহৎ অনেক কিছু দিয়ে যাবে- এটা একটা সহজাত প্রত্যাশা। আর সে করণেই বাংলা ভাষার যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের ওপরে অনেক বেশী। অর্থাৎ বাংলা যদি প্রেমের ভাষা হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে সেইসব কবি, সাহিত্যিক, লেখক, উপন্যাসিকদের জন্যে যাঁরা বাংলা ভাষায় প্রেমের মহত্ব এবং বৃহত্ব প্রকাশ করেছেন– এবং তাঁদের সেই প্রকাশনা দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতাও লাভ করেছে। সহজেই বোধগম্য যে, বাংলাকে যদি বিজ্ঞানের ভাষা হিসাবে আমরা পরিচিত করতে চাই, তাহলে আমাদের কি করণীয়। অথবা অর্থনীতির ভাষা হিসাবে, কিংবা অন্য যে কোনো বিষয়ের ভাষা হিসাবে, যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর এবং যা বাংলার গন্ডী পেরিয়ে অন্য জাতী ও সংস্কৃতির জন্যেও শিক্ষনীয় এবং লাভজনক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমরা স্মরণ করতে পারি– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলী ইংরেজীতে অনুবাদ করার পর নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার জন্যে গীতাঞ্জলীর ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন, তা ঠিক নয়। তাঁর অনুবাদের প্রধান কারণ ছিল বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য্য ইংরেজী-ভাষীদেরকে অবহিত করা, বাংলা সংস্কৃতি সম্পদের কিছুটা ভাগ অন্য সংস্কৃতিকে দান করা। নজরুল দেখিয়েছিলেন, ভালবাসার সাথে সাথে বাংলা ভাষা একটি কার্যকর এবং মোক্ষম বিদ্রোহের ভাষাও হতে পারে। এরকম উদাহরণ হয়ত আরও আছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় এরকম উদাহরণ আরো বেশী হোক, সেই আশাই রাখছি।

যোগাযোগ ঃ anis@anisrahman.org

তথ্যসূত্র

[1]
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.statista.com%2Fchart%2F12868%2Fthe-worlds-most-spoken-languages%2F&psig=AOvVaw2FpAalZU-NOuUcnjYeXPVG&ust=1581035624173000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCR7efWu-cCFQAAAAAdAAAAABAY
[2]
https://www.daytranslations.com/blog/wp-content/uploads/2017/07/What-Are-The-Most-Important-Languages-of-The-21st-Century.jpg
[3] https://www.researchtrends.com/issue-31-november-2012/the-language-of-future
[4] Avwbmyi ingvb, ÒWordprocessing, databases, and spreadsheets in Bengali,Ó in Calcutta, Bangladesh, and Bengal Studies, 1990 Bengal Studies Conference Proceedings, Ed. Clinton B Seely, Michigan State University, pp. 263–271.
Link: https://books.google.co.vi/books/about/Calcutta_Bangladesh_and_Bengal_Studies.html?id=e9stX1v82wcC
[5] Sonargaon font, http://luc.devroye.org/fonts-32002.html

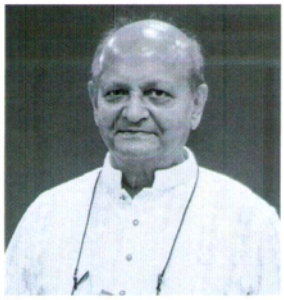

# প্রবাসে দ্বিতীয় প্রজন্মের একুশে ফেব্রুয়ারি

ডঃ আশরাফ আহমেদ

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। একদিকে দিনটিকে আমাদের স্বাধীনতার সূতিকাগার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ও অধিকার আদায়ের প্রতীক মনে করা হয়। অন্যদিকে বিগত সত্তর বছরে দিনটি বাঙালির নিজস্ব ও আবহমান কালের ভাষা ও সংস্কৃতিরও প্রতীক হয়ে উঠেছে। ফলে সারাবছর যারা কোনো মাথা ঘামায় না, ফেব্রুয়ারি এলে তারাও সবাই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার ঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে আসে। সভা সমিতিতে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের পক্ষে জোরালো বক্তৃতা দেয়। পান্তা খায়, পিঠা খায়, পড়ুক বা না পড়ুক বইমেলায় যায় ও বই কেনে। আর একুশ তারিখ এলেই একগুচ্ছ ফুল হাতে নিয়ে শহীদ মিনারে জড়ো হয়ে ক্যামেরা-সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়িয়ে খাঁটি বাঙালি সেজে যায়। কারো বাপেরও সাধ্য নেই তার বাঙালিত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করার।

অথচ বছরের এগারটি মাস কথা বলার সময় তারা ইংরেজির ব্যবহার ছাড়া বাংলা বলতে পারে না। অফিস আদালতে নথি লেখে ইংরেজিতে। আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে ধর্মাবতার না বলে ইয়োর অনার বলে বিচারককে সম্বোধন করে। বিচারক হিসেবে রায়টি লেখে ইংরেজিতে। কোনো কালেই বাঙালির কৃষ্টিতে না থাকা যখন তখন জন্মদিন পালন করে ঘটা করে। দিনটি পালনে পিঠার বদলে কেক কাটে। লুঙ্গি-পাজামার বদলে ঘুমাতে যায় স্লিপিং স্যুট পরে। সবজি, মাছ, মুরগি, খাসি বা গরুর মাংসের তরকারি, সালুন অথবা ভুনার বদলে পছন্দ করে ভেজিটেবল, ফিশ, চিকেন, মাটন অথবা বিফ-এর কারি বা ফ্রাই। এমনকি অজপাড়াগাঁয়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিও এ ধরনের মানসিকতা থেকে মুক্ত নন। বাড়ির কাছাকাছি বাংলা মাধ্যম স্কুল ছেড়ে তাঁরাও সন্তানদের পাঠান দূরের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। বাংলায় সুন্দর ও উপযুক্ত শব্দ থাকা সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিক বক্তৃতায় অধ্যাপক আবু সায়ীদ চৌধুরীর মতো ব্যক্তির কণ্ঠে ইংরেজির ব্যবহার দেখেও দুঃখ পেয়েছি। তেমনি শ্রুতিকটু লেগেছে শ্রোতা ও বক্তাদের মাঝে একজন অবাঙালি না থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান সেমিনারে শিক্ষক ও সঞ্চালকদের ইংরেজিপ্রীতি দেখে।

আমাদের সংস্কৃতির সবকিছুই অনুকরণীয় না হলেও বাংলা ভাষা, বাঙালির আচরণ ও খাদ্যাভ্যাস অনেক ক্ষেত্রেই উন্নত। সেসব উপেক্ষা করে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির এভাবে বিদেশি গ্ল্যামারের দিকে ঝুঁকে পড়াকে আমার কাছে একপ্রকার পাপাচারই মনে হয়। সুপ্রিম কোর্টের এক প্রধান বিচারপতি ৩১ ডিসেম্বরের রাতে তাঁর সরকারি বাসভবনে আলোর বন্যা বইয়ে টেক্সস বারবিকিউ-র অনুকরণে আদিম ও বর্বর উন্মাদনায় একটি আস্ত খাসিকে আগুনে ঝলসে ইংরেজি নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। অথচ তিনযুগ আমেরিকার রাজধানীর উপকণ্ঠে বাস করেও আজ পর্যন্ত কোনো প্রতিবেশীকে এমন নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে দেখিনি ও শুনিনি।

ফেব্রুয়ারি এলেই এসব নিয়ে লেখালেখিও হয় বিস্তর। পাকিস্তানি আমল থেকেই তা দেখে আসছি। কোনোই প্রতিকার হয় না। কাজেই ভাঙা রেকর্ড বাজানোর মতো একই কথা বারবার লিখে কাগজের কলেবর বৃদ্ধি করার কোনো মানে হয় না। বরং অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করি।
চার দশক থেকে আমি এক প্রবাসী বাঙালি। অধিকাংশ প্রবাসী বাঙালি তাদের সন্তানদের নিয়ে মহাচিন্তিত। তাদের অনুযোগ হচ্ছে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের আয়েশের জীবন ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলাম। অথচ বিদেশি পরিবেশের ভিন্ন সংস্কৃতিতে মানুষ হচ্ছে বলে সন্তানরা বাঙালি সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তারা বাংলা শিখছে না, বাঙালি খাবার, বাংলা গান পছন্দ করছে না ইত্যাদি ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দোষের আঙুলটা সন্তানদের দিকেই প্রসারিত। আমার ধারণা এই পিতা-মাতারা নিজেদের জীবন যাপনের সীমাবদ্ধতার দিকে না তাকিয়ে সন্তান থেকে খুব বেশি কিছু আশা করছেন। যে কোনো কারণেই হোক আমি নিজের ইচ্ছায় বাংলাদেশ ছেড়ে এসেছি। এখন এই বিদেশি পরিবেশে জন্ম নেওয়া ছেলেমেয়ের কাছ থেকে পুরোপুরি বাঙালি আচরণ আশা করা নিতান্তই বোকামি।

এ কথা ঠিক যে, পরিবেশই একটি মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আচরণ নির্ধারণ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুকাল থেকে প্রাপ্তবয়স্কে পৌঁছা পর্যন্ত সন্তানরা মা-বাবার সান্নিধ্যেই বেশিক্ষণ থাকে। ফলে সন্তানের ওপর মা-বাবার প্রভাবই বেশি পড়ার কথা। এখন আমরা যদি স্মার্ট হতে গিয়ে ঘরেও বাংলার বদলে ইংরেজি বলি, বড়া-চচ্চড়ি-সিঙ্গারা-সমুচার বদলে ফ্রেঞ্চ-ফ্রাই ও হ্যামবার্গার বেশি পছন্দ করি, পহেলা বৈশাখ ও একুশে ফেব্রুয়ারি, পঁচিশে মার্চের বদলে নিউ ইয়ার্স ডে বা ভ্যালেন্টাই'স ডে পালন করি, তাহলে সন্তানরা কীভাবে বাঙালির মতো আচরণ করবে? সন্তানের স্কুল ও বন্ধুবান্ধবের কথা জানতে না চেয়ে যদি প্রতিদিন ঘরে ফিরে টেলিভিশনের সামনে বসে থাকি, সন্তানের সাথে তবে বাঙালি কেন, ঘরে থাকা পিতা-মাতার সাথেই যে যোজন দূরত্ব সৃষ্টি হবে সেটা বুঝতেতো খুব কষ্ট হওয়ার কথা নয়। আবার এ কথাও ঠিক যে জীবিকার্জনের প্রয়োজনে অনেকের পক্ষেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের পর সন্তানের দিকে মনযোগ দেওয়া ততটা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সমস্যাটি জটিল হলেও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কয়েকটি পরিবার সমাধানের পথ খুঁজে নিতে চেষ্টা করতে পারে।

এখন মূল কথায় আসি। ভিন্ন সংস্কৃতির পরিবেশে আপনার আমার সন্তানরা আসলেই কি তাদের বাঙালিত্ব হারিয়ে ফেলছে? কতটুকু হারাচ্ছে? হারিয়ে ফেললেও তাতে বাঙালির, বাংলাদেশের বা আপনার আমার কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে? এ সম্পর্কে কয়েকটি একান্তই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করছি। বছর পনের আগে আমাদের এক বন্ধুর এদেশে জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠা দু'টি কন্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেই আয়োজন করলো এক বৈশাখী উৎসবের। অনুষ্ঠানটির নাম দিলো 'বৈশাখী ব্যাং'। ব্যাং শব্দটি নিয়েছে বাংলা শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপে। ওয়াশিংটন ডিসি এলাকার সাত আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করে আসছে বেশ জাঁকজমকের সাথে। বাংলা ক্লাবগুলো পালা করে প্রতিবছর অনুষ্ঠানের স্বাগতিক দায়িত্ব পালন করে আসছে কোনো বিরতি ছাড়াই। কিন্তু আমরা বাঙালিরা যেভাবে চিৎকার ও ঝগড়া ফ্যাসাদ করে, দুই থেকে তিন ঘণ্টা দেরিতে যে আয়োজনে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করি, এদের অনুষ্ঠান হয় তা থেকে অনেক ভিন্ন। সেদিন শাড়ি, লুঙ্গি ও পাজামা-পাঞ্জাবির ব্যবহার এবং বাঙালির মুখরোচক খাবারের আয়োজন থাকলেও বাংলাদেশের জনপ্রিয় গানগুলি ছেলেমেয়েরা পরিবেশন করে ওদের আধুনিক ঢং এবং নাচের সাথে। হিন্দি ইংরেজি গানও থাকে। বাঙালিদের সাথে সেসবে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীরা। দর্শকদের মাঝে আমার মতো বাঙালির উপস্থিতি কম হলেও বিভিন্ন সংস্কৃতির অতিথিরা বিশাল হলরুমের প্রতিটি আসন দখল করে রাখে। অনুষ্ঠান চলাকালে সনাতন বাঙালির মতো নিজেদের মাঝে গল্পগুজবে মত্ত না থেকে সেই দর্শকরা পিনপতন নিস্তব্ধতায় বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদেরই অনুষ্ঠান আগ্রহের সাথে উপভোগ করে থাকে।

এদেশে জন্মের পর থেকেই আমার ছেলেদের ওর মা বিভিন্ন বাংলা ছড়া ও গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। বয়স অগ্রগামী হতে আমি ওদের সপ্তাহান্তিক বাংলা স্কুল ও বিভিন্ন বাংলা অনুষ্ঠানে নিয়ে গেছি এবং অংশগ্রহণ করিয়েছি। হাই স্কুলে ওঠার পর থেকে স্বাভাবিক কৈশোর ও তারুণ্যের জোয়ারে বাংলার প্রতি ওদের উৎসাহে ভাটা পড়েছিলো। আমরাও পীড়াপীড়ি করিনি। অথচ বহু বছর পর গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ করেছি আমার বড় ছেলে ওর শিশুপুত্রকে নিজের শিশুকালে শেখা এবং মায়ের মুখে শোনা বাংলায় ঘুমপাড়ানির গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। আমি কোনো বাংলা বই হাতে নিলে সে বানান করে তা পড়ার চেষ্টা করে। যখনই সুযোগ পায়, বাংলাদেশে বেড়াতে যায় স্ত্রীপুত্রসহ। সেখানে কোনো বড় ঘটনা ঘটলে আমি জানার আগেই আমাকে ফোন করে খবর দেয়, উদ্বেগ অথবা আনন্দ প্রকাশ করে। অথচ জন্মগতভাবে প্রাত্যহিক কথোপকথন, জীবনযাপন এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনে সে পুরোপুরি একজন আমেরিকান নাগরিক।

ছোট ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলে বলেছিলাম বাংলাদেশ থেকে নতুন যেসব ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়ে আসে, সে যেন তাদের সাহায্য করে। আমার কথা না শুনে সে গিয়ে নাম লেখালো কলেজের বাংলাদেশ ক্লাবে। সভাপতি হয়ে বাঙালির পাশাপাশি ক্লাবের সদস্য করে নিলো ভিন্ন ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির কিছু বন্ধুকে। সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে আয়োজন করলো একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান। শুনে আমি চাইলাম বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করতে। সে কোন দোকান থেকে ডিনারের জন্য ভালো বাংলাদেশি খাবার আনা যায় তা জানতে চেয়ে বললো, 'বাকিটা আমাকে আমার মতো করে করতে দাও।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, গোটা দশেক টেবিল ঘিরে প্রায় একশত ছাত্রছাত্রী বসে আছে বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তৃতা শুনতে। কোনো নাচ, গান বা আবৃত্তির ব্যবস্থা নেই। অতিথিদের মাঝে মাত্র পনেরজনের মতো ছিলো বাংলাদেশের, বাকিরা বিভিন্ন দেশের।

বক্তা একজন। আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠা বছর তিরিশেক নিচের এক যুবক। পড়াশোনা শেষে বাংলাদেশে গিয়ে থেকেছে কয়েক বছর এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে গবেষণা করেছে। যা পেয়েছে তা টেড টক (ঞবফ ঞধষশ) নামে অতি উন্নতমানের শিক্ষা ও প্রেরণামূলক একটি প্রতিষ্ঠানে প্রায় এক ঘণ্টার বক্তৃতা দিয়েছিলো। যারা টেড টক সম্পর্কে জানেন, তাদের কাছে এর মান, গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রতিষ্ঠানটি সেই বক্তৃতার ভিডিও করে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাতে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাঙালি ও বাংলাদেশের যত গৌরবময় ও উল্লেখযোগ্য তথ্য আছে, বক্তৃতার সাথে সাথে তা দৃষ্টিনন্দন ভিডিওতে দেখানো হয়েছে। এতে একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা কীভাবে দেশটিকে স্বাধীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে– অসংখ্য ঐতিহাসিক ক্লিপসহ ধাপে ধাপে তা বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু তথ্য নয়, বক্তার আবেগময় কণ্ঠে বাংলাদেশকে একটি সুন্দর ও অপার সম্ভাবনাময় শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে ইংরেজিতে।

সেই একুশের অনুষ্ঠানে ভিডিওটি দেখানোর পর বক্তা মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়ালো। কীভাবে ও কোথা থেকে সে এসব তথ্য জোগাড় করেছে তা বলার পর দর্শক-শ্রোতারা বাংলাদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করলো। বলাবাহুল্য প্রশ্নকারীদের অধিকাংশই বাঙালি ছিলো না। অনুষ্ঠান শেষে কিছুতেই মনে হলো না যে আমরা যেভাবে দিবসটি উদযাপন করে অভ্যস্ত, সেভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন না করে প্রবাস প্রজন্মের বাঙালি প্রতিনিধিটি কোনো অন্যায় করে ফেলেছে। ওরা বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষা-সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বরঞ্চ এক মহৎ কাজই করে চলেছে। দু'দিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিচালিত পত্রিকায় এই অনুষ্ঠানের উল্লেখ করে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, খাদ্য, ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে বিশাল ও সুন্দর এক সংবাদ ছাপা হয়েছিলো। শুনে সুখি হবেন যে সংবাদটির রচয়িতা ছিলো পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এক মার্কিন ছাত্রী!

এই গেলো সপ্তাহে এক পিঠা উৎসবে এক বন্ধু খুব যত্ন করে প্রতিটি পিঠার ছবি তুলছিলো এবং পিঠার নামটি টুকে নিচ্ছিলো। বললো যে ওর অনুপস্থিত কন্যা দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছে ছবি তুলে প্রতিটি পিঠার নাম যেন ওকে পাঠানো হয়। কেমন মেয়ে সে? এদেশে জন্মে, একবারও বাংলাদেশে না যাওয়া, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ও পিএইচডি করা, এক বছর মার্কিন অর্থমন্ত্রী টিমোথি গেইটনারের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করা এবং এক ইংরেজ সহপাঠীকে বিয়ে করা মেয়ে। তাকে কখনো বাঙালির কোনো জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। তাই বলেতো প্রবাস প্রজন্মের এই মেয়ে বাংলাদেশ ও বাংলা সংস্কৃতিবিমুখ হয়ে আছে বলা যায় না। প্রকারান্তরে সামাজিক ও পেশাগত পরিবেশে সে কি বাংলাদেশেরই প্রতিনিধিত্ব করছে না?

আমার অভিমত হচ্ছে ওরা বাঙালিত্ব হারিয়ে ফেলছে না। ওদের মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালির সংস্কৃতির বিবর্তন হচ্ছে মাত্র। শুধু বাঙালির নয়, পৃথিবীর সব সংস্কৃতিই বিবর্তিত হচ্ছে প্রতিদিন। এই একুশে ফেব্রুয়ারির কথাই ধরুন। এখন দেশজুড়ে একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের যে ঘটা দেখা যায়, সে

তুলনায় পাকিস্তানি জমানায় আমার ঢাকা কলেজে পড়ার সময়ে নেহাতই নগণ্য ছিলো। ঠিক একইভাবে বর্তমানে জাতীয়ভাবে মহা আড়ম্বরের সাথে পহেলা বৈশাখ উদযাপনটি আমি বাংলাদেশ ছাড়ার আগে একবারও প্রত্যক্ষ করিনি। চল্লিশ বছর আগে বাংলাদেশের পোষাক, কথ্য ও লিখিত ভাষায় শব্দের ব্যবহার, নাটক, সিনেমা, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার যে পরিবর্তন, তা বাঙালির সংস্কৃতির বিবর্তনের ফলেই। বাংলাদেশে বর্তমান শিশু-কিশোর-যুবকরা যে যে শব্দ প্রয়োগে ও শারীরিক প্রকাশভঙ্গিতে কথা বলে, তা বুঝতে বহু বছর বিদেশে বাস করা আমাকে অনেকটা সময় ব্যয় করতে হয়। এই পরিবর্তনটি আমার চোখে যেভাবে ধরা পড়ে, বাংলাদেশে থাকা আমার বয়সী একজনের কাছে তা মোটেই পরিবর্তন মনে হবে না।

আপনি হয়ত বলবেন বাংলাদেশে এসব পরিবর্তনের সাথেতো আমার প্রবাস প্রজন্মের ছেলেমেয়ের আচরণে অনেক পার্থক্য। কোনোই দ্বিমত করছি না। এই পার্থক্য শুধু সময়ের নয়, স্থানের ও পরিবেশের প্রভাবটিই বেশি। কিন্তু বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্তটা ওরা নেয়নি, নিয়েছিলাম আমরা ওদের দোহাই দিয়ে। তারপরও আপনার বয়স্ক সন্তান সপ্তাহ, মাস বা বছর পেরিয়ে বাড়ি ফিরেই কি মায়ের হাতের বাঙালি রান্না খেতে বায়না ধরে না? আপনি যেন বুঝতে পারেন তেমন ভাঙা ভাঙা বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে আপনার সাথে কথা বলে না? বাংলাদেশে আপনার ভাই বোন আত্মীয়স্বজন কে কেমন আছে তা জানতে চায় না? মোট কথা ওরা ছোট থাকতে এবং বেড়ে ওঠার সময় আপনি যা যা শিখিয়েছিলেন তাই কি ফেরত দিচ্ছে না? আপনি যা শেখাননি তা কীভাবে ওরা ফেরত দেবে?

এই দ্বিতীয় প্রজন্ম বাঙালির জীবন অনেক জটিল, অনেক কষ্টের। এদের সামনে আছে নিজ ইচ্ছায় যা কিছু করার হাতছানি, সমাজে বাধা দেওয়ার কিছু নেই। আছে বিভিন্নভাবে জীবনকে উপভোগ করার উপায়। বিপরীতে আছে পিতা মাতার বাংলাদেশ থেকে বয়ে আনা কঠিন অনুশাসন। আরো আছে নিজের ইচ্ছাকে বলি দিয়ে মা বাবার চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়ে সবকিছুতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার এক অসম্ভব দাবি। এই টানাপোড়নে পরাস্ত হয়ে শুধু বাংলা সংস্কৃতিই নয়, ওদের ঘর ত্যাগ এমনকি আত্মহননের ঘটনাও বিরল নয়। এই অবস্থায় আমাদের কাছে যতই আবেগের হোক, তাদের কাছে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটিকে নিজ থেকে ভালোবাসতে আশা করা বোকামি। আর যদি সময় মতো শিখিয়েও থাকেন তা সময় ও উপযুক্ত মনে করলেই সে গাইবে।

আপনি বা আমিই কি মা-বাবার প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করেছি?

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

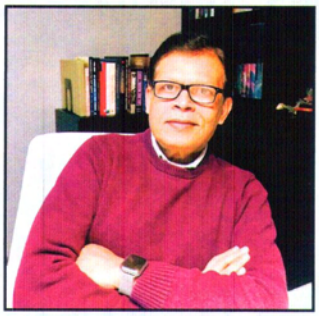

# ছেলেবেলার একুশ

## আনোয়ার ইকবাল

আমার জন্মের প্রায় সাড়ে ছ' বছর আগে এসেছিলো ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। মায়ের ভাষার সম্ভ্রম রক্ষা করতে সেদিন সাহসী একদল তরুণ তরুণী বুক পেতে দিয়েছিলো বন্দুকের নলের সামনে। তাঁদের সেই আত্মত্যাগ আমাদের যে শুধু নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকার এনে দিয়েছিলো তা নয়, আমাদের মধ্যে তৈরি করেছিলো একটি নতুন সত্তা, বুকের ভেতরে বুনে দিয়েছিলো বাঙালি জাতীয়তাবোধের বীজ। সেই আত্মত্যাগের ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর মানচিত্রে একদিন যোগ হয়েছিলো বাংলাদেশ নামের আমাদের স্বাধীন দেশটি।

'৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যখন আমাদের দেশটি পাকিস্তানের অংশ ছিলো, তখন সে দেশে একটি বেসামরিক সরকার ছিলো। '৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করলেও '৫৬ সালে ইস্কান্দার মির্জা যখন পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন, মূলতঃ তখনই একটি দীর্ঘ সময়ের জন্যে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যায়। '৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের পূর্বাংশের জনগণ আর গণতন্ত্রের দেখা পায়নি।

'৪৭-এ পাকিস্তান হওয়ার সময় থেকেই বাঙালিকে কখনো পূর্ণাঙ্গ নাগরিক অধিকারের স্বাদ পেতে দেওয়া হয়নি। গণতান্ত্রিক সরকার হওয়া সত্ত্বেও '৫২তে ভাষার অধিকারের দাবিতে যাঁরা পথে নেমেছিলেন, তাঁদের উপর পাকিস্তানি শাসকেরা গুলি চালাতে দ্বিধা করেনি। স্বভাবতই এমন ধারার সরকার শহীদ দিবস পালন করাতে খুবই অস্বস্তিবোধ করতো। তারপর শাসন ক্ষমতা চলে গেলো সামরিক বাহিনীর হাতে, তখন একুশের দিনটি উদযাপন করা বাঙালির জন্যে আরো দুরূহ হয়ে পড়লো। আমার যদিও সেই সময় জন্ম হয়নি, পত্রপত্রিকার নিবন্ধ আর বড়দের কাছে শোনা গল্প থেকে সেটা আন্দাজ করতে কোনো বেগ পেতে হয় না।

কিন্তু যত দুরূহই হোক, প্রতিকূল পরিবেশ, দুঃশাসন আর সরকারের রক্তচক্ষু অবজ্ঞা করে বাঙালিরা কিন্তু দিনটিকে পরের বছর থেকেই প্রকাশ্যে উদযাপন করে আসছে। মনে রাখার মতো বয়স হবার পর থেকে সেটাই দেখেছি। প্রথমবারের মতো শহীদদের আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ হয়েছিলো আমার বয়স যখন আট পেরিয়েছে, ১৯৬৭ সালে। সে বছর গিয়েছিলাম বাবার হাত ধরে একুশে ফেব্রুয়ারির সকালে। দিনের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে যাওয়া হয়েছে তারো দু'বছর পরে, ১৯৬৯ সালে; আমার এক চাচার অনুগ্রহে। তিনি সম্পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মা-বাবার কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে আমাকে শহীদ মিনারে নিয়ে গিয়েছিলেন। দশ বছর বয়সের সেটা এক অমূল্য স্মৃতি।

যখন আর একটু বড় হলাম, তখন সুযোগ হলো বন্ধুদের সাথে দল বেঁধে শহীদ মিনারে যাওয়ার। তবে তা দিনের প্রথম প্রহরে নয়, ভোরের আলো ফোটার পর। মধ্যবিত্ত পরিবারে তখন ফুল কেনার বিলাসী সামর্থ্য ছিলো না। আমাদের মতো অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকাদেরতো প্রশ্নই ওঠে না। শহীদ মিনারে যাওয়ার আগে তাই আমাদের প্রথম কাজ ছিলো কোনো বাগানওয়ালা বাড়িতে ফুল চুরি করতে ঢোকা। ব্যাপারটা অন্যায় জেনেও সেদিন একটুও অপরাধবোধ মনে আসতো না। আঁজলা ভরে গাঁদা ফুল নিয়ে যখন শহরের মূল সড়কে পৌঁছতাম, ততক্ষণে সেখান দিয়ে খণ্ড খণ্ড প্রভাতফেরী যেতে শুরু করেছে। নিজের পাড়ার দলটা দেখতে পেলেই আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গানটি গাইতে গাইতে ভিড়ে যেতাম তার সাথে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ শহরে আমাদের ছোটবেলায় কোনো শহীদ মিনার ছিলো না। ফেব্রুয়ারি মাসে কোনো একটা খালি মাঠ কিংবা রাস্তার মোড়ে কাঠ, প্লাইউড দিয়ে গড়ে তোলা হতো অস্থায়ী শহীদ মিনার। প্রভাতফেরী শহরের অলিগলি ঘুরে গিয়ে থামতো তার পাদমূলে। আমরা সেখানে ঢেলে দিতাম আমাদের ফুলের নৈবেদ্য।

প্রভাতফেরীর এইসব বিষণ্ন মিছিলের প্রস্তুতি হতো পাড়ায় পাড়ায়। পাড়ার বড় ভাই আর বোনেরা থাকতেন এর দায়িত্বে। সব আয়োজন শেষে একুশের ভোরে যখন তাঁরা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে বেরোতেন, তখন তাঁদের গায়ে থাকতো সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী আর কালো পাড় সাদা শাড়ি। এই কালো পাড় সাদা শাড়ি আর সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী শুনে আজকে ব্যাপারটাকে খুব সাদামাটা মনে হতে পারে। তা, সাদামাটাই বটে। সেই সময়ে, বর্ণমালার নকশায় সাজানো শাড়ি আর রঙ বেরঙের পাঞ্জাবীর কোনো ধারণাই কারো ছিলো না। একুশ তখন উৎসব নয়, ছিলো শ্রদ্ধা জানানোর একটি বিনম্র প্রয়াস। বড়রা তো তবু শাড়ি, পাঞ্জাবী পরতে পারতেন, আমাদের মতো অল্পবয়সীদের সেই সৌভাগ্য প্রায়ই হতো না।

আসলে সেই সময় আমাদের কারো একটির বেশি পাঞ্জাবী থাকতো না। সেটাও তোলা থাকতো ঈদ বা অন্য কোনো ধর্মীয় পার্বণে পরার জন্য। রোজকার পরার শার্ট আর হাফপ্যান্ট, মেয়েরা ফ্রক– এই পোষাকেই আমরা উদযাপন করতে যেতাম একুশে ফেব্রুয়ারি। শুধু বুকের উপরে পিন দিয়ে গেঁথে থাকতো এক টুকরো ভাঁজ করা কালো ফিতে।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাতফেরী, মিনারে ফুল দেওয়ার আগে আরো অনেকগুলো ঘটনা ঘটতে থাকতো। শহরের বেশিরভাগ দোকানে তখন সাইনবোর্ড লেখা থাকতো ইংরেজি বা উর্দুতে। ভাষা আন্দোলনের দিনে সেটা অনেকের কাছে ভালো ঠেকতো না। কোনো কোনো দিন শহীদ মিনার থেকে ফেরার পথে অতি উৎসাহী কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়ে সেইসব দোকানের কাঁচ ভেঙে দিয়ে প্রতিবাদ জানাতেন। সেই সম্ভাবনা এড়াতে একুশে ফেব্রুয়ারির কয়েক দিন আগে থেকেই দোকানের মালিকেরা কালো কাপড় দিয়ে তাদের সাইনবোর্ডগুলো ঢেকে দিতে শুরু করতো। এই ধরনের আরো একটি কাজ করতেন গাড়ির মালিকেরা। ইংরেজিতে লেখা গাড়ির নাম্বার প্লেট নিয়ে সেদিন বাইরে বেরোলে ঢিল খাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। পারতপক্ষে সেদিন কেউ তাই গাড়ি নিয়ে বেরোতেন না। যাদের নিতান্তই না বেরোলে নয়, তাঁরা কার্ডবোর্ডের উপর বাংলায় গাড়ির নাম্বার লিখে সেগুলো দিয়ে আসল প্লেটটি ঢেকে রাখতেন।

প্রভাতফেরীর প্রস্তুতির একটা মূল অংশ ছিলো পোস্টার আর ফেস্টুন তৈরি করা। জমকালো, রঙচঙে কিছু নয়। পোষাকের মতো এগুলোর ধরনও ছিলো খুব সাদামাটা। সাদা কিংবা খাকি ভারী কাগজে কালো আর লাল কালি দিয়ে লেখা হতো স্লোগান কিংবা ফুটিয়ে তোলা হতো বর্ণমালা। বড়দের, যাঁদের হাতের লেখা ভালো, তাঁদের এই পোস্টারগুলো লেখার দায়িত্ব দেওয়া হতো। ছোটরা সেগুলো একটা বাঁশের কঞ্চির দু'পাশে ময়দা দিয়ে বানানো আঠায় সাঁটার কাজটি করতাম। এসবের খরচ যোগানোর জন্যে পাড়াজুড়ে চাঁদা তোলা হতো। চাঁদা ঠিকমতো উঠলে বাড়তি টাকা খরচ করা হতো ব্যানার বানাতে। ব্যানার বানানোর জন্যে ব্যবহার করা হতো কালো থান কাপড়, তার উপরে সাদা অক্ষরে লেখা থাকতো পাড়ার কিংবা সংগঠনের নাম।

আর একটি জিনিস ঘটতো একুশে ফেব্রুয়ারি এলে। সাংগঠনিক, কখনো কখনো ব্যক্তি উদ্যোগে প্রকাশিত হতো অসংখ্য স্মরণিকা। আমাদের মধ্যে যাদের লেখালেখিতে উৎসাহ ছিলো, স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ার সময় বের করতাম দেয়াল পত্রিকা। বড় ক্লাসে ওঠার পর উৎসাহ এলো ছাপানো কাগজে স্মরণিকা বের করার। সেটা করতে গিয়ে বুঝলাম, কাজটি কত কঠিন। প্রথমত, স্মরণিকা বের করতে যে টাকা লাগতো তার পুরোটাই বিজ্ঞাপন ও ব্যক্তিগত অনুদান থেকে যোগাড় করতে হতো। ছোট শহরে যতগুলো সাময়িকী বের হতো সেই তুলনায় বিজ্ঞাপনদাতা বা অনুদানকারীর সংখ্যা ছিলো অপ্রতুল। তারপর প্রচ্ছদ তৈরি, ছাপার জন্য তার প্লেট বানানো, হাতে করা টাইপ সেটিং থেকে প্রুফ দেখা, বাঁধাই, সময় মতো ছাপাখানা থেকে সেটাকে বের করে নিয়ে আসা, এগুলো পর্বতপ্রমাণ কাজ। কিন্তু কখনো কাউকে অকৃতকার্য হতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।


ট্যাক্স সিজন শুরু
কম সময়ে ভালো ট্যাক্স রিটার্ন পেতে
আজই যোগাযোগ করুন
দক্ষ এবং স্বনামধন্য কনসালটেন্ট
সালাউদ্দিন মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
যোগাযোগ : ৭০৩-২৪৩-১৫০০
৭০৩-৩০০-৮৬৮৫

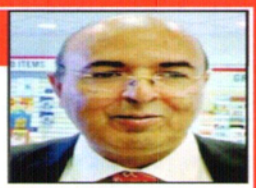

ASRS Inc.
Salahuddin M. Yahya
Mcom.Actg.,FCMA, EA
IRS Enrolled Agent
313 North Glebe Road, #209
Arlington, VA 22203
Business | Corporation Tax | Non Profit | Social Org Tax
Book Keeping and Financial Accounts and all other Business Services.
Phone: 703-243-1500. Fax: 703-243-9372, Cell: 703-300-8685
Email: smyaus@gmail.com | Website: www.asrsincgov.com
Income Tax-Accounting adn Payroll-
Business Tax and Consulating

# ভাষা এবং যাপিত জীবন

ওয়াহিদা নূর আফজা

আমি কোনো সমাজবিদ বা ভাষাতত্ত্ববিদ নই। শুধুমাত্রই একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে ভাষার সাথে জীবনের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক লক্ষ্য করেছি। কখন কি ভাষায় কথা বলছি এর সাথে আমার মস্তিষ্ক এবং মননের চিন্তাভাবনার একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। জ্ঞান হবার পর থেকে যে ভাষায় কথা বলি তা ছিল কলকাতার বাংলা। দেশভাগের আগেই আমার মায়ের পরিবার কলকাতা থেকে প্রথমে পাবনা শহরে বসতি গড়েন। আম্মা পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় পড়তে আসেন, সেই সাথে নিয়ে আসেন মুখের বিশুদ্ধ বাংলা। আব্বা ছিলেন খাস চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জের। তবে তিনি পড়াশোনার সূত্রে চল্লিশ দশক থেকেই ঢাকা শহরের বাসিন্দা। মায়ের মুখের ভাষাই আমার ভাষা হয়ে যায়। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় ঢাকার বনানী থেকে কুমিল্লার ঠাকুরপাড়ায় আমার পরিবার চলে যায়। ভর্তি হই মডার্ণ স্কুলে। ক্লাসে আমার মতোই আরও নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। এদের কেউ কেউ সরকারি কর্মকর্তার মেয়ে- বাবাদের বদলীর চাকরি। আরও ছিল স্থানীয় মেয়েরা। তাদেরই একজন আমার ভাষা নিয়ে একদিন কটাক্ষ করলো। বলল, "এতো শুদ্ধ ভাষা নিয়া কী কেউ কবরে যাবেনি?" মনে হয় নিজের অজান্তেই তখন থেকে আমার ভাষা বদলাতে থাকে। আমরা আগে বলাতাম "ছেলেধরা", আর কুমিল্লা শহরে তাকে বলে "পোলাচোর"। ধীরে ধীরে মফস্বলের আঞ্চলিক শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হতে থাকি। এতে সুবিধা হয় যে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে পারার ফলে এলাকার মেয়েদের সাথে খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তাদের সাথে পাড়া বেড়াই। মফস্বল শহরের মূল নির্যাসটা শুষে নিতে পারি।

☒এর তিন বছর পর ঢাকায় ফেরা এবং তার দু'বছর পর ক্যাডেট কলেজে চলে যাওয়া। আমার রুমমেট সেতু ছিল খুলনার মেয়ে। সেতু আর বান্ধবি চাঁপার সাথে বিতর্ক প্রতিযোগিতার পস্তুতির সময় অনেক শব্দ ঠিক করে নিই। তারপরও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ভাষা পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে যায়।

☒ভাষা নিয়ে যে অদ্ভুত বিষয়টি খেয়াল করেছি তা হলো যার সাথে কথা বলছি তার কথার ছন্দটি যদি ধরতে পারি তাহলে দেখা যায় যে তার মানসিকতা কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। এই যেমন কেউ একজন হাজিগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলার সময় "নুন" বা "স্যালুন" শব্দগুলো ব্যবহার করছে, এখন তার সাথে কথোপকথনের সময় আমিও যদি এই শব্দগুলো ব্যবহার করি তাহলে অপরপক্ষ খুব সহজ হয়ে উঠে। স্বভাবের সহজতা তখন অপরপক্ষের মানসিকতা বুঝতে সাহায্য করে। আবার কেউ যখন তার আঞ্চলিকতা নিজে খুবই স্বচ্ছন্দ্য তখন তার আত্মবিশ্বাসে চির ধরানো যায় না। আবার অন্যদিকে আঞ্চলিকতার সাথে আন্তর্জাতিকের সংমিশ্রণ ভাষার গতিকে বেগবান করে। মনের ভাব প্রকাশের যথার্থতা শব্দভাণ্ডারের প্রাচুর্যের সাথে সম্পর্কিত। এজন্য দেখা যায় একটি উন্নত জাতির শব্দভাণ্ডার ঐশ্বর্যময়।

☒পরিণত বয়সে অনেক বছর বাংলায় লেখালেখি করার পর ভাবলাম ইংরেজিতে লিখি। তখন খেয়াল করে দেখলাম বাংলায় লেখার সময় ভাবতাম আমার আধুনিকমনস্ক চিন্তাভাবনাগুলোকে কিভাবে আরও সার্বজনিন করা যায়। লেখক চাইবে না পাঠক-মনের থেকে তার লেখার বিষয়বস্তুর খুব বেশি ব্যবধান থাকুক। আবার ইংরেজিতে লিখতে গিয়ে দেখলাম আমি আসলে চিন্তাভাবনায় অতোটা বিশ্বজনীন দার্শনিক হয়ে যাইনি। আমি হয়তো আমার গোষ্ঠীর মধ্যে আধুনিক-মনস্ক কিন্তু পশ্চিমের তুলনায় অতোটা নই। ইংরেজিতে যতো বিবিধ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আধুনিক লেখা পড়েছি, তা বাংলা ভাষায় পড়ার সুযোগ নেই। আবার বাংলা ভাষায় আমার দেশের বিভিন্ন প্রান্তের যে গল্পগুলো পাব তা কিন্তু সব বাংলাতেই লেখা। চিন্তাভাবনার আন্তর্জাতিকতা আর আঞ্চলিকতার সেতু বন্ধনের জন্য নিজের মতো করে ভাষাকে গড়ে নিতে হয়। আমাদের বাঙালি জাতির জন্য রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে একটি বড় উদাহরণ। ভাষার নানারকম কলাকৌশলে কবিগুরু কখনও আঞ্চলিকতাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, আবার আন্তর্জাতিকতাকে আঞ্চলিকভাবে বোধগম্য করেছেন। আমার ভাষা আমাকে "আমি" করে। বাংলা হরফে বাংলা লেখা আর আরবি হরফে উর্দু লেখা দুটি ভিন্নজাতি চাইলেও একই ধারায় চিন্তা করতে পারে না। একটি ভাষার স্রোতস্বিনি ধারাকে বাঁধ দিয়ে গতিপথ রুখে দিলে চাইলে একটি জাতি হয়ে উঠে শেকড়-বিহীন। আমাদের পূর্ব-পুরুষ বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন বলে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গর্জে উঠেছিলেন।

# ডিসি মেট্রো এলাকার প্রথম রেপ্লিকা শহীদ মিনার ও তার ধারাবাহিকতা...

ডঃ আরিফুর রহমান

কাজ ছাড়া আমার সময় কাটে না। এটি আমার পুরনো অভ্যাস। বৃহত্তর ওয়াশিংটনে আসার পর আমি এ এলাকার গোটা কয়েক সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দর্শক হিসেবে যাওয়া শুরু করি। এরই মধ্যে আমার অভ্যাসবশত আয়োজকদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই এবং ক্রমে একটি সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি। সেটি হলো বাংলা স্কুল। ১৯৯৬ থেকেই বিসিসিডিআই বাংলা স্কুলের প্রায় সব অনুষ্ঠানের মঞ্চসজ্জার কাজটি আমার উপর এসে পড়তো। তাই প্রতি অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চসজ্জায় নতুনত্ব খুঁজতে হয়েছে আমাকে। এমনি সময় অমর একুশে পালনের আয়োজন শুরু হলো। আমার মাথায় ঘুরছে, একুশের মঞ্চসজ্জায় কী করা যায়? বাংলা স্কুল থেকে চিন্তা করতে করতে বাসায় ফিরলাম। রাতে মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি এলো। মঞ্চে প্রতিস্থাপন করা যাবে, সেই আকারের একটা রেপ্লিকা শহীদ মিনার তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। যেখানে স্কুলের ফান্ডে হাত না দিয়ে আমরা নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে বাচ্চাদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করি, শহীদ মিনার তৈরির জন্য তো আর স্কুলের ফান্ড খরচ করা যাবে না। কী করা যায়, ভাবছি। হঠাৎ মনে হলো আমার ঘরের একটা খাট এখন ব্যবহার করছি না। মেরিনাকে অর্থাৎ আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস না করেই তুলে ফেললাম বিছানা, খুলে ফেললাম খাটের পাটাতনের কাঠ। শুরু হয়ে গেলো শহীদ মিনার তৈরির কাজ। পর পর কয়েক রাত ঘরের মধ্যে কাঠ কাটাকাটি করে, দুই তিনদিনের মধ্যে মনের অদম্য ইচ্ছার উপর ভর করে শেষ করলাম আমার রেপ্লিকা শহীদ মিনারের প্রজেক্ট। তারপর শহীদ মিনারটিকে কম সময়ের মধ্যে মঞ্চে প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে একে ফুল দিয়ে সাজিয়ে নিলাম। আমার এই প্রজেক্টের কথা মেরিনা আর আমার মেয়েরা ছাড়া আর কেউ জানতো না। অনুষ্ঠানের দিন সকাল সকাল ভেন্যুতে গিয়ে মঞ্চে শহীদ মিনার প্রতিস্থাপন করে ফেললাম। ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকায় সর্বপ্রথম রেপ্লিকা শহীদ মিনারের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সেদিন বাংলা স্কুলের আয়োজক এবং দর্শকদের অন্তঃস্থল থেকে যে প্রশংসা আমি পেয়েছিলাম, সেটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমি আরো অভিভূত হয়েছিলাম যখন অন্যান্য সংগঠন আমার এই শহীদ মিনারটি তাদের অনুষ্ঠানে ব্যবহার করার অনুমতি চাইছিলো। বাংলা স্কুলের অনুষ্ঠানে ব্যবহারের পর জনাব শাহ আলম মজুমদার তাঁর পরিচালিত মেরিল্যান্ডের তৎকালীন বাংলা স্কুলের অনুষ্ঠানে এই শহীদ মিনারটি ব্যবহার করেছেন। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা (BAAI)-এর তৎকালীন সভাপতি ডঃ ওসমান ফারুকও এটি নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য। এরপর শহীদ মিনারটি আর্লিংটন লাইব্রেরিতে এক মাস যাবত দর্শকদের জন্য প্রদর্শনীতে ছিলো। সে প্রদর্শনী শেষে Four Mile Run-এ অবস্থিত আর্লিংটন কাউন্টি কালচারাল অফিসের একটি কক্ষে প্রদর্শনীতে ছিলো প্রায় এক মাস যাবত।

BAAI-এর সভাপতি মিসেস ইনারা ইসলাম সমন্বয়কারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই গ্রুপের পক্ষে ডঃ শোয়েব চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ডিসি একুশে এলায়েন্সের (DCEA) ২০১০ সালের প্রথম অনুষ্ঠানের মঞ্চসজ্জার জন্য বিরাট আকারের শহীদ মিনারটিও আমি তৈরি করেছিলাম। সেই শহীদ মিনারটি ২০১২'র DCEA'র একুশের মঞ্চও আলোকিত করেছিলো।

আমার বানানো এ দু'টি শহীদ মিনার ছাড়াও BCCDI-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব সফি দেলোয়ার কাজল তাঁর সময়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে বাংলা স্কুলের জন্য একটি প্রফেশনাল মানের শহীদ মিনার সম্মানী দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন। শহীদ মিনারটির মূল ডিজাইনার এবং নির্মাতা ছিলেন ভার্জিনিয়ার জনাব শফিকুর রহমান তুহিন। সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন জনাব সফি দেলোয়ার কাজল ও জনাব নঈম রহমান। সেই শহীদ মিনারটি অনেকদিন যাবত BCCDI I DCEA-এর অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে আসছিলো।

২০১৭ সালে জনাব হারুনুর রশিদ PVC পাইপ ব্যবহার করে তৈরি করেছেন একটি রেপ্লিকা শহীদ মিনার। এই শহীদ মিনারটি ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯-এর DCEA আয়োজিত একুশের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়েছে।

# বাংলাদেশ আমার দেশ

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-এ শুরু করে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বারে বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন করে পেয়েছি বাংলাদেশ। এ আমার দেশ, এখানে বাংলা আমার মাতৃভাষা। তারপর পেছনে তাকাবার আর ফুরসৎ নাই। আমার দেশে আমরা সবাই বাঙ্গালী। এখানে ঈদ, পূজা, মাঘ পূর্ণিমা, পহেলা বৈশাখ সবই আমাদের আনন্দের দিন। আমরা করি আনন্দ সবাই একসাথে।

এখানে নিজের চাক্ষূস ঘটনাটা বলতে চাই যে ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে আমরা চারজন করে ১৪৪ ধারা ভাঙব বলে এসএম হল থেকে বেরিয়ে যাই। আমি ছিলাম প্রথম দলে। ইয়ুনিভার্সিটির প্রধান (আর্টস) বিল্ডিং ছিল মেডিক্যাল কলেজের পূর্ব পাশে। বাস থেকে নামতেই পুলিশ আমাদের ধরে ফেলে। এত সকালে প্রথমেই ধরা পড়ব ভাবতেই পারিনি। পুলিশও বুঝতে পারছিল না তখন আমাদের নিয়ে কি করবে? পাকিস্তানী অফিসারের নির্দেশের জন্যে ওরা ভ্যাবা চেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জোরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে ইয়ুনিভার্সিটির ভিতরে দৌড়ে পালিয়ে যাই। পুলিশ তাড়া করেও গেঁটের ভেতরে ঢোকেনি। আমি ও পাশের ভাঙ্গা দেয়াল টপকে রেল লাইন ধরে মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের দিকে যাই। সেখানে সামনেই জগন্নাথ হলে পাকিস্তান ন্যাশনাল এ্যাসেম্বেলির অধিবেশন হচ্ছিল। প্রচুর পুলিশ ছিল চারিদিকে। আমি সামনে যেতে না পেরে বেড়ার দরজার মত ফাঁক দিয়ে হোস্টেলের মধ্যে ঢুকে পড়ি। হোস্টেলের প্রধান গেটে কিছুক্ষণ পর গুলি চালান শুরু হয়। আমি তখন দাঁড়িয়ে সেখানে। আহতদের (তখন নিহত) মেডিক্যাল সার্জারীতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সব শেষ।

আমরা অনেকেই ভাগ্য অন্বেষনে বা বিভিন্ন কারনে নিয়তি নিয়ে এই দেশে পাড়ি জমিয়েছি। কিন্তু ভুলি নাই আমাদের শৈশব, বৃষ্টিতে ভিজে ঝড়ের মধ্যে আম কুড়ানোর কথা। রেল লাইন ধরে গ্রামে বা পদ্মার ধার ধরে দূরে হাঁটু ভেজা চরের ঝাউ বনে উদ্দেশ্যবিহীন একসাথে বেড়ান। পাঠশালার গোয়ালিনীর মেয়ে ললিতার কথা এখনও মনে হয়। আমাদের অনেক সুযোগ রয়েছে আমাদের বাংলাদেশকে সত্যিকারের সোনার দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্নভাবে অবদান রাখার এবং দেশপ্রেমী বাঙালি হিসেবে সেটা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। করার। তাই প্রবাসে থেকেও আমরা স্বদেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারি এমনকি এখানে প্রবাসের মাটিতে, ওয়াশিংটনেও প্রচুর বাংলাদেশী রয়েছে যারা মিলেমিশে অনেক মহৎ কাজ করতে পারে এবং দেশের জন্যও সম্মিলিতভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ওয়াশিংটনের অনেক বাংলাদেশী সংগঠনও রয়েছে, তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে সারা বছরব্যপী, এছাড়া আমাদের নতুন ন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের নিয়েও অনেক কাজ করছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এই সমন্বিত ২১শে ফেব্রুয়ারি পালনও তারই কিছুটা নমুনা। সফল হোক আমাদের অকৃত্রিম প্রচেষ্টা বাংলা সংস্কৃতিকে প্রবাসের মাটিতেও বাঁচিয়ে রাখার। মহান ভাষা শহীদদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলী।

বিনীত–

মযহারুল হক

## পরানজুড়ে

শুক্লা গাঙ্গুলী

জননীর জড়ানো নাভী ছিন্ন করে
যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো
তার মুখেই শুনি ভাষার কথা
যন্ত্রণায় নীল হয়ে আসা
বেদনা থাকে মায়ের মুখ নিঃসৃত
কান্না থাকে শিশুর আগমনে–
ভাষা যে মায়ের ভাষা।

বিরান জমিতে কৃষক নিড়ানি চালায়
টুকরো টুকরো মেঘ সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে
শুখা জমিতে নেমে আসে বাংলার
হাওড় বাওড় উপচিয়ে জল গড়ায় সাগরে।

সালটা ছিলো বায়ান্ন,
মাসটা শিমুল পলাশের ফাগুন–
রাজতন্ত্র সিঁধ কেটে ঘরে– ভাষা চায়
আমার মুখের ভাষা–
অযুত কোটি বছরের বাংলা ভাষা

মা রাজপথ ধুয়ে রক্ত মোছেন
আঁচলে রাখেন সন্তান
স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ দাঁড়ায়
ভাষাসৈনিক হয়ে– ওমে বাঁচে
মাতৃভাষা আমি আগলে রাখি লালিত স্নেহে
ধারণ করি
পরানজুড়ে।

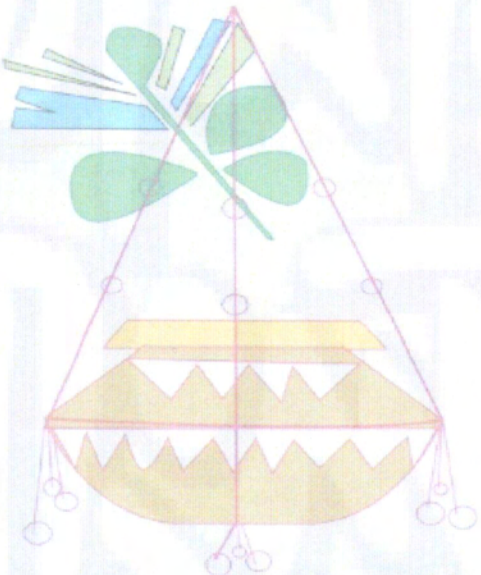

## বর্ণ বৈষম্য

মোস্তফা তানিম

খণ্ড-ৎ হয়েও কেউ বেঁচে থাকে,
ঢ য়-শূন্য-ঢ় তার কষ্ট বলে কাকে?
হসন্ত নিশ্চিহ্ন প্রায়,
মুখচোরা বর্ণরা চাপা পড়ে যায়।
'ত' বেশি বেশি আসে কবিতায়,
ওষ্ঠে 'প' প্রায়শই ঝলকায়,
দীর্ঘ-ঈ হতেছে নিরুপায়,
মূর্ধন্য-ণ নয়ন জলে ভাসায়।

## পানসী তুমি কার

সামিনা আমিন

পানসী তুমি কার? তুমি কার কথা বলো?
তোমার নিজের গল্প কবে কোথায় হারালো?
কেউ কোনোদিন জানতে চেয়েছে তোমার ইতিকথা?
কোন ঘাটে বাঁধা রইলো পড়ে তোমার নিজস্বতা?
নীরব আঁধারে নিভৃতে সেই কথাদের বাস,
বলবে তুমি, বুকের অতলে লুকোনো ইতিহাস?
নদীর স্রোতে ভেসে যায় শত বছরের স্মৃতি
ডুবে যায় মোহনার জলে তোমার আত্মাহুতি
ঘাট থেকে ঘাট, গ্রামগঞ্জ, অচেনা বন্দর
নামধামহীন বসতবাড়ি, অপরিচিত ঘর,
ছুটে ছুটে গিয়েছো তুমি অজ্ঞাত ঠিকানায়
কত কালের বৈরাগ্য, বিরহ, বেদনায়,
কত কালের বিচ্ছেদ শেষে নাইওর আসে ফিরে
শৈশবের খোঁজে কান্না হাসি জড়ানো তীরে তীরে,
অশ্রু হাসির অজানা গল্প যাত্রীর মুখে মুখে
তোমারও কি মন হেসেছে, কেঁদেছে তাদের দুখে সুখে?
নদীর স্রোতে ঘূর্ণিপাকে ভেসে যাও তুমি বানে
জীবন জোয়ারে বয়ে চলি আমি কোন কূলে কে জানে!
ভেজা পাটাতনে একটি কোণে ভাবি আমি এক মনে
তোমার আমার ঠিকানা যেন মিলেছে কোন খানে
আমরা দু'জনে ভেসে যাই হায়, অদৃষ্টের উজানে
তোমার আমার গল্প কথা হবে আজ কানে কানে
কোথায় গিয়ে পাতবো শয্যা, দূর দ্বীপ, বনভূমি
তোমার ভরসায় রইলাম আমি, আমার ভরসায় তুমি!!

## একুশের চেতনায় বোবা বর্ণমালা

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

একুশের সকালে আমার জীর্ণ শহরে
সকালের রোদের জামা ভেদ করে উঁকি দেয়
প্রশ্নবিদ্ধ একদল মানুষ!
কে যায় ঐ নগ্নপদে শুদ্ধ স্লোগান মিছিলে?
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ হাসে নিষিদ্ধ কুটিরে
বুভুক্ষু পেট, নিরন্ন দেহে নগ্নপদে হেঁটে বেড়ায়
চুন-সুরকির অন্তরাল, খবরের কাগজে কিংবা চায়ের শেষ চুমুকে।
মিল-অমিলের প্রশ্নবিদ্ধ বিবেক,
পার্থক্যের মিল খুঁজে ফেরে একুশের ধূমায়িত সকাল।
পলিথিনে মোড়ানো আদম-হাওয়ার নিষিদ্ধ ফল!
গন্ধ শুঁকে পাহারায় বসে কুকুরের দল,
হয় যদি ক্রুশবিদ্ধ ফের মুখোশের স্বপ্নচারী।
বিবেকের বোতাম খুলে দেয় পলিথিন,
আগামি দিনের বর্ণমালা চিৎকার করে বলে–
"দেখ আমায় দেখ হে নগ্নপদ যাত্রী।"
ভোরের কুয়াশা ভেদে অগণিত মিছিল
তাকিয়ে রয় বোবা বর্ণমালার দিকে!

## প্রভাতফেরী

মিজানুর খান

মাকে নিয়ে যাচ্ছি হেঁটে...
নগ্ন পায়ে বর্ণমালা হাতে
মুখে অমর একুশের গান,
একুশের ডাকে আজ
বাংলার ঘরে ঘরে জেগে ওঠে প্রাণ।
খোলা আকাশের নীচে
প্রভাতফেরী এসে দাঁড়ায় শহীদের বেদীমূলে,
চেয়ে দেখি
শহীদের রক্তমাখা শার্ট
ছেয়ে গেছে কৃষ্ণচূড়ার রঙিন ফুলে।
আমরা ফিরে যাবো সগৌরব
বর্ণমালা বুকে...
এঁকে যাবো বাংলার রূপ,
বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবো
শহীদের রক্তে গড়া নির্ভীক একুশের ধূপ।

## একুশ আমার শব্দ শব্দ খেলা

শাহানা শৈলী

একুশ আমার হৃদয়ের কাব্যগাথা
একুশ আমার অজর-অমর কবিতা
একুশ আমার না-বলা কথকতা
একুশ আমার অশ্রু বারিধারা
একুশ আমার কাব্য-কথার মালা
একুশ আমার ভাই হারানোর জ্বালা!

একুশ আমার আগুন-পলাশ শাখা
একুশ আমার ফাগুন-কোকিল ডাকা
একুশ আমার রক্তে রাঙা ঢাকা
একুশ আমার মাকে 'মা' বলে ডাকা
একুশ আমার প্রভাতফেরীর মেলা

একুশ আমার অকূল নদীর পাড়
একুশ আমার স্মৃতির শহীদ মিনার
একুশ আমার ভিত্তি স্বাধীনতার
একুশ আমার প্রথম অহংকার!

## দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা

মিজানুর ভূঁইয়া

চোখের তারায় স্বপ্ন যেদিন বেঁধেছিলো বাসা,
সেদিন থেকেই মনের ভেতর এলো ভাষার আশা।
হাজার তোপের মুখেও বীর করেনি নত মাথা
বুক পেতে এগিয়ে গিয়েছে মানেনি কোনো বাধা।
আকাশ বাতাস কেঁদেছিলো শোকের মাতম করে
দস্যুরা সব নিচ্ছে আমার মুখের ভাষা কেড়ে।
ঢাকার বুকে তাক করেছে হাজার কামান সেনা
লুটেপুটে নিতে চায় মায়ের গলার সোনা।
কামান দাগিয়ে গুলি ছুঁড়ে পাকবাহিনী ভাষা কেড়ে নেবে
মায়ের ঘরের বীর সন্তান সহজে কি তা ছেড়ে দিবে?
মায়ের কাছে শেখা প্রথম ভাষা স্বর্গসুখে ভরা
মুখের সেই বুলি কেড়ে নেবে এমন আছে কারা।
জীবন দিলো বীর সন্তানেরা মায়ের ভাষার নামে
সেই গৌরবের ইতিহাস সবাই আজ বিশ্বজুড়ে জানে।
দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা, মায়ের মুখের ভাষা
গর্বে ভরা বুকে তাই ফুটে উঠে হাজার রকম আশা।

# YOUR FRIEND, YOUR NEIGHBORHOOD REALTOR®

## Nazir Ullah, the Realtor you can Trust with Confidence!

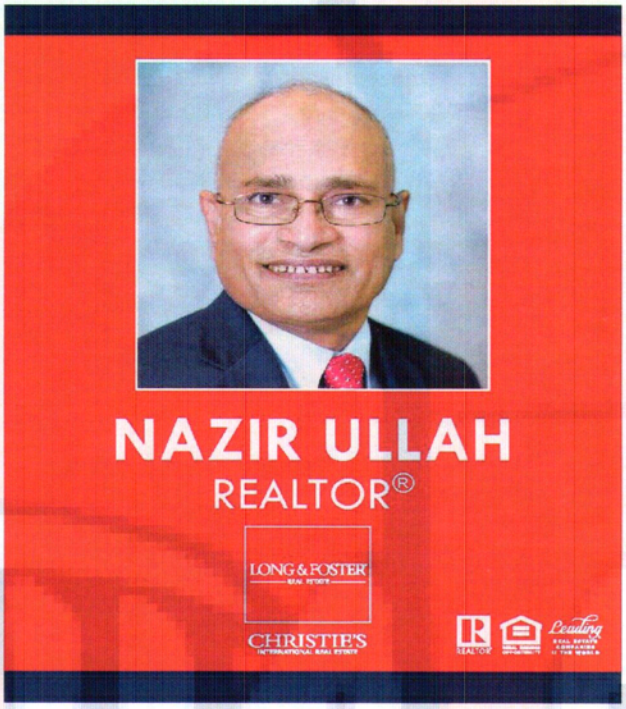


**Nazir Ullah gets the results that you want: buying, selling, or investing in real residential property.**

*Your house, your dream. Your agent, Nazir Ullah. The name of your trust!*

301-537-9885 Cell
301-424-0900 Office
Nazir.Ullah@longandfoster.com

LONG & FOSTER
CHRISTIE'S

www.NazirUllah.LNF.com

Rockville Centre Office: 795 Rockville Pike, Rockville, MD 20852

**TOP PRODUCER • MULTI-MILLION DOLLAR PRODUCER • LICENSED IN MARYLAND, VIRGINIA, AND DC**
**NOTARY PUBLIC**

সৌজন্যে...
প্রবাসে বাংলাদেশের গর্বিত কণ্ঠস্বর
বাংলাদেশী

# অমর একুশে

একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস। এটি বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের একাধারে মর্মান্তিক ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন। ১৯৫২ সালের এ দিনে (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৯) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহীদ হন। তাই এ দিন শহীদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বঙ্গীয় সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালি মুসলমানের আত্ম-অন্বেষায় যে ভাষাচেতনার উন্মেষ ঘটে, তারই সূত্র ধরে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভাষা-বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন হয় এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তার চরম প্রকাশ ঘটে।

ওই দিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়। এতে আবুল বরকত, আবদুল জব্বার ও আবদুস সালামসহ কয়েকজন ছাত্রযুবা হতাহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সমবেত হয়। নানা নির্যাতন সত্ত্বেও ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি পুনরায় রাজপথে নেমে আসে। তারা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের জন্য অনুষ্ঠিত গায়েবি জানাজায় অংশগ্রহণ করে। ভাষাশহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ, যা সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি গুঁড়িয়ে দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারির এ ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন আরও বেগবান হয়।

১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে ৯ মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তখন থেকে প্রতি বছর এ দিনটি জাতীয় 'শোক দিবস' হিসেবে উদ্যাপিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা এক মিনিটে প্রথমে রাষ্ট্রপতি এবং পরে একাদি মে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষকবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং সর্বস্তরের জনগণ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার-এ এসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এ সময় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' গানের করুণ সুর বাজতে থাকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হয়। এদিন শহীদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে রেডিও, টেলিভিশন এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেশের সংবাদপত্রগুলিও বিশেষ ে ড়পত্র প্রকাশ করে।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যে চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে বাঙালিরা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, আজ তা দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্যদেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

Sadab

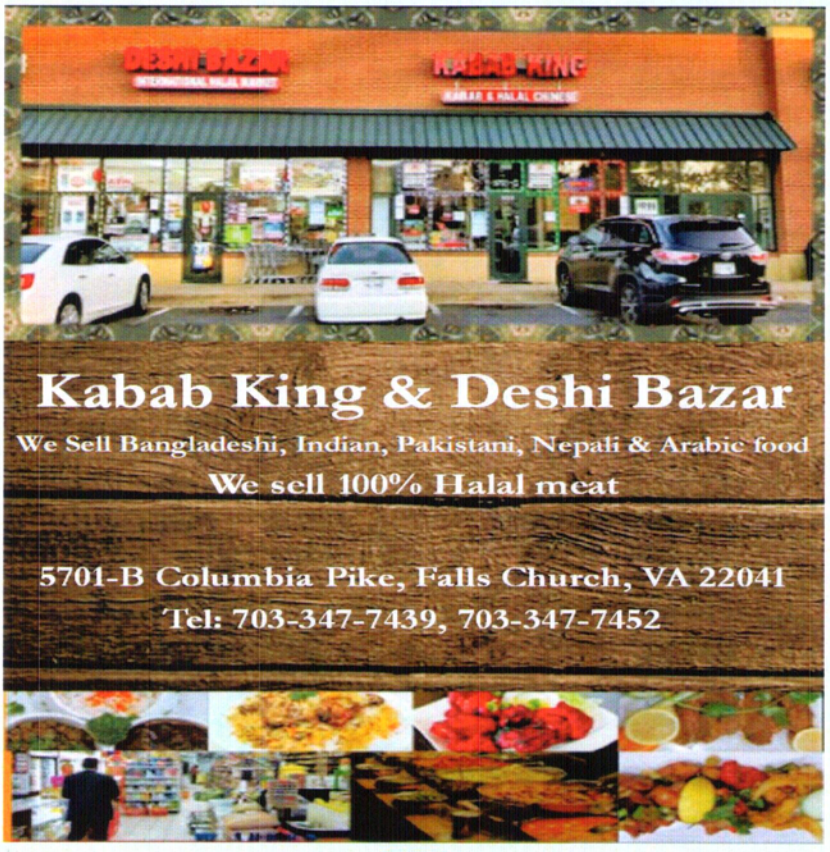

# স্মৃতির পাতায় একুশে উদযাপন ২০১৯

# স্মৃতির পাতায় একুশে উদযাপন ২০১৯

# স্মৃতির পাতায় একুশে উদযাপন ২০১৯

# স্মৃতির পাতায় একুশে উদযাপন ২০১৯

# স্মৃতির পাতায় একুশে উদযাপন ২০১৯

# স্মৃতির পাতায় একুশে উদযাপন ২০১৯

# স্মৃতির পাতায় একুশে উদযাপন ২০১৯

# স্মৃতির পাতায় একুশে উদযাপন ২০১৯

# স্মৃতির পাতায় একুশে উদযাপন ২০১৯

মানুষ মানুষের জন্য
জীবন জীবনের জন্য

আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত

# একাত্তর ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

(মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত সংস্থা) স্থাপিত : ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

**এ যাবত বাস্তবায়িত কার্যক্রম :**

- বঙ্গবন্ধুর জীবনীর ওপর লেখা দুর্লভ বই মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে বিতরণ।
- অসচ্ছল পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন, রিক্সা ও গবাদি পশু বিতরণ।
- শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র এবং অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী, পোষাক ও মেধাবৃত্তি প্রদান।
- গ্রামের গরিব রোগীদের জন্য মাসিক ফ্রি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং ঔষধ পত্র বিতরণ।
- গুণীজনদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান।
- কিডনী রোগীকে ১৫ হাজার ইউএস ডলার প্রদান।

**বাস্তবায়িত কার্যক্রম চলমান থাকার পাশাপাশি প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম :**

- সমাজের অবহেলিত-বঞ্চিতদের দুঃখ-বেদনার কথা বেশি বেশি প্রকাশের জন্য প্রস্তাবিত 'দৈনিক একাত্তর' অনুমোদনের অপেক্ষায়।
- মুমূর্ষ রোগীদের জীবন রক্ষায় ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রদান।
- আমেরিকার 911 আদলে চাঁদপুর থেকে ফ্রি ইমার্জেন্সি সেবা চালু করা; যা সকল নাগরিকের জন্য ২৪ঘন্টা সেবাদানে সদা প্রস্তুত থাকবে।
- চাঁদপুর শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কে নির্মাণাধীন সাত তলা ভবনের নিচতলায় একাত্তর ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র দপ্তর প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বাকী ১২টি ফ্ল্যাটের ভাড়া বাবদ সমুদয় অর্থ আর্তমানবতার সেবায় ব্যয় করা।
- নিঃস্বার্থ মানবসেবার গুণগতমান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আধুনিক ও সৃজনশীল বিবিধ কার্যক্রম প্রণয়ন।

**পারভীন পাটওয়ারী মনি**
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
'একাত্তর ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'
প্রধান উপদেষ্টা সম্পাদক
'দৈনিক একাত্তর'।

## সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

**কবির উদ্দিন পাটওয়ারী**
প্রতিষ্ঠাতা
'একাত্তর ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'
প্রধান ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
'দৈনিক একাত্তর'।

C&T Home Care
Home care you can trust

# *পারিবারিক সেবায় আস্থা রাখুন*

অচেনা ব্যক্তির পরিবর্তে পরিবারের সদস্য অথবা বন্ধু-বান্ধব কে আপনার সেবায় নিয়োজিত রাখুন।

বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

প্রতি ঘন্টায় **১৬** ডলার আয় করুন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই।

**আমাদের ঠিকানা**

৭৯২৫ জোন্স ব্রাঞ্চ ড্রাইভ, সুইট এল এল ১২০, ম্যাকলিন, ভার্জিনিয়া ২২১০২

**যোগাযোগ**

৩০১-৩১২-০০৪৫

www.candthomecare.com

va@candthomecare.com

# ডিসি একুশে এলায়েন্স এর পক্ষ থেকে

## ভাষা সৈনিকদের "অমর একুশে পদক-২০২০" প্রদান

'ডিসি একুশে এলায়েন্স' (ডিসিইএ) ২০২০-এর আয়োজনে আজ উদযাপিত হতে যাচ্ছে "মহান ভাষা শহীদ দিবস" ও "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস"। সকল ভাষা শহীদ এবং ভাষা সৈনিকদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী! ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীকার আদায়ের আন্দোলন এবং তারই পথ ধরে '৭১-এ রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসেছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। তাই ভাষা শহীদ এবং ভাষা সৈনিকদেও স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদানের এই আয়োজনের অংশ হিসেবে এবার ডিসি একুশে এলায়েন্স-এর পক্ষ থেকে 'অমর একুশে পদক-২০২০' প্রদান করা হয় বাংলাদেশ অবস্থানরত কয়েকজন মহান ভাষা সৈনিকদের। যাদের আমরা '৫২ ভাষা আন্দোলনে হারিয়েছি, তাঁদের প্রতি অন্তরের ভালবাসা ও গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী ছাড়া আমাদের আর দেবার কিছু নেই, কিন্তু যে সব ভাষা সৈনিক এখনো আমাদের মাঝে রয়েছেন... বেঁচে আছেন, তাঁদের এই পদক প্রদান করে যোগ্য সম্মান দিতে পেরে ডিসি একুশে এলায়েন্স সম্মানিত বোধ করছে। ডিসি একুশে এলায়েন্স-এর পক্ষ থেকে পদক প্রাপ্ত ভাষা সৈনিকদের অভিনন্দন ও শ্রদ্ধাঞ্জলী!!!

আয়োজক ডিসি একুশে এলায়েন্স এবং ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রিয় বাংলার পক্ষ থেকে এই সম্মাননা পদক ভাষা সৈনিকদের হাতে তুলে দেন প্রিয়লাল কর্মকার এবং যাদের সহযোগিতায় এদের সবার তথ্য সংগ্রহ এবং সম্মাননা পদক দেয়া সম্ভব হয়েছে, তাদের প্রতি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। তারা হলেন: জনাব আজাদ রহমান (ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন স্মৃতি পরিষদ) এবং জনাব আব্দুল্লাহ আল মুক্তাদির (ভাষা আন্দোলন স্মৃতি রক্ষা পরিষদ)।

### ভাষা সৈনিক আহমেদ রফিক :

আহমেদ রফিক '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় ভাষা সৈনিক, ১৯২৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর যিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শুধু ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়ে ক্ষান্ত হননি, ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন সাহিত্য গবেষক এবং আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উপর তিনি অনেক গবেষণা করেছেন, এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা। তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৫ সালে পেয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের "একুশে পদক", যা আহমেদ রফিককে দিয়েছে অর্জনের গৌরব। ডিসি একুশে এলায়েন্সের পক্ষ থেকে প্রিয়লাল কর্মকার আহমেদ রফিকের হাতে তুলে দেন "অমর একুশে সম্মাননা পদক-২০২০"।

ডিসি একুশে এলায়েন্স এবং ওয়াশিংটন প্রবাসী সকল বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে ভাষা সৈনিক আহমেদ রফিককে অজস্র অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা।

## ভাষা সংগ্রামী হাজেরা নজরুল :

হাজেরা নজরুল, '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের একজন নবীন ভাষা সংগ্রামী, যিনি নারী হয়েও থেমে থাকেননি পেছনের সারিতে, এগিয়ে গিয়েছেন অদম্য সাহস ও শক্তি নিয়ে... নিজের সমস্ত সহযোগিতা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন আন্দোলনে শক্তি জোগাতে সে সময়ের ভাষা সৈনিক ও নেতৃবৃন্দের সাথে। মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এবং তার মর্যাদা রক্ষার অনমনীয় প্রত্যয় তাকে তাড়িত করেছে। একজন তরুণী হয়েও আন্দোলনে এগিয়ে যাবার, এটাই ছিল তাঁর প্রেরণা উৎস।

ডিসি একুশে এলায়েন্সের পক্ষ থেকে প্রিয়লাল কর্মকার প্রফেসর হাজেরা নজরুলের হাতে তুলে দেন "অমর একুশে সম্মাননা পদক-২০২০"। ডিসি একুশে এলায়েন্স এবং ওয়াশিংটন প্রবাসী সকল বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে ভাষা সংগ্রামী হাজরা নজরুলকে অজস্র অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা।

## ভাষা সৈনিক কামাল লোহানী :

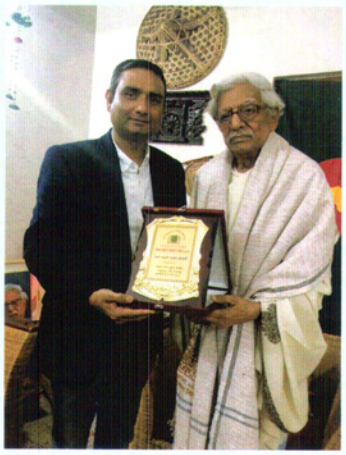








কামাল লোহানী '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় ভাষা সৈনিক, ১৯৩৪ সালের ২৬শে জুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি শুধু ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ নয়, সেসময় থেকে শুরু করে স্বাধীনতা উত্তর সময়ে তিনি অব্যাহত রেখেছেন তাঁর বাংলা সাহিত্য চর্চা এবং এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা। তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৫ সালে পেয়েছেন বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত "একুশে পদক", যা কামাল লোহানীকে দিয়েছে অর্জনের গৌরব। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তিনি ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত শিল্পকলা একাডেমির মহা-পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন।

ডিসি একুশে এলায়েন্সের পক্ষ থেকে প্রিয়লাল কর্মকার কামাল লোহানীর হাতে তুলে দেন "অমর একুশে সম্মাননা পদক-২০২০"। ডিসি একুশে এলায়েন্স এবং ওয়াশিংটন প্রবাসী সকল বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে ভাষা সৈনিক কামাল লোহানীকে অজস্র অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা।

## ভাষা সৈনিক সাবির আহমেদ :

সাবির আহমেদ '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় ভাষা সৈনিক, ১৯২৪ সালের ১৫ই জুলাই যিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শুধু ভাষা আন্দোলনের একজন সৈনিকই নন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে একজন কবি এবং সাহিত্যপ্রেমী, তাঁর অসংখ্য রচনায় ফুটে উঠেছে মানবিকতা, সাম্য এবং প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয়। মানুষের ভালবাসায় সিক্ত হয়েছে তার সৃষ্টিশীল কাজ এবং এটাই তাঁর অর্জনের আনন্দ।

ডিসি একুশে এলায়েন্সের পক্ষ থেকে প্রিয়লাল কর্মকার সাবির আহমেদের হাতে তুলেদেন "অমর একুশে সম্মাননা পদক-২০২০"। ডিসি একুশে এলায়েন্স এবং ওয়াশিংটন প্রবাসী সকল বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে ভাষা সৈনিক সাবির আহমেদকে অজস্র অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা।